ইতিহাসের বাঁকে
মুহাম্মদ নূরউল্লাহ্

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ

ইতিহাসের বাঁকে মুহাম্মদ নূরউল্লাহ

সম্পাদনায়

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ

বাংলাদেশ
কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা।

www.pathagar.com

ইতিহাসের বাঁকে
মুহাম্মদ নূরউল্লাহ

সম্পাদনায়

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ

প্রকাশনা ও মুদ্রণে

মোহাম্মদ বেনাউল ইসলাম

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১, ৭১১০৫৬২

প্রচ্ছদ

ন্যাশনাল গ্রাফিক্স

৫৯/৩/৪, পুরানা পল্টন, ঢাকা

ফোন ঃ ৯৫৬৪৬৬২, ৯৫৫৩৪২৭

শুভেচ্ছা মূল্যঃ

একশত টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

৭২, জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর , ঢাকা

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।

রিডার্স চেম্বার, ৮৩, স্টেশন রোড, চট্টগ্রাম।

ITIHASHER BAANKE

MUHAMMAD NURULLAH

Edited By Sarkar Shahabuddin Ahmed

Price : Tk. 100.00, US$ 4.00

ISBN. 984-493-046-4

www.pathagar.com

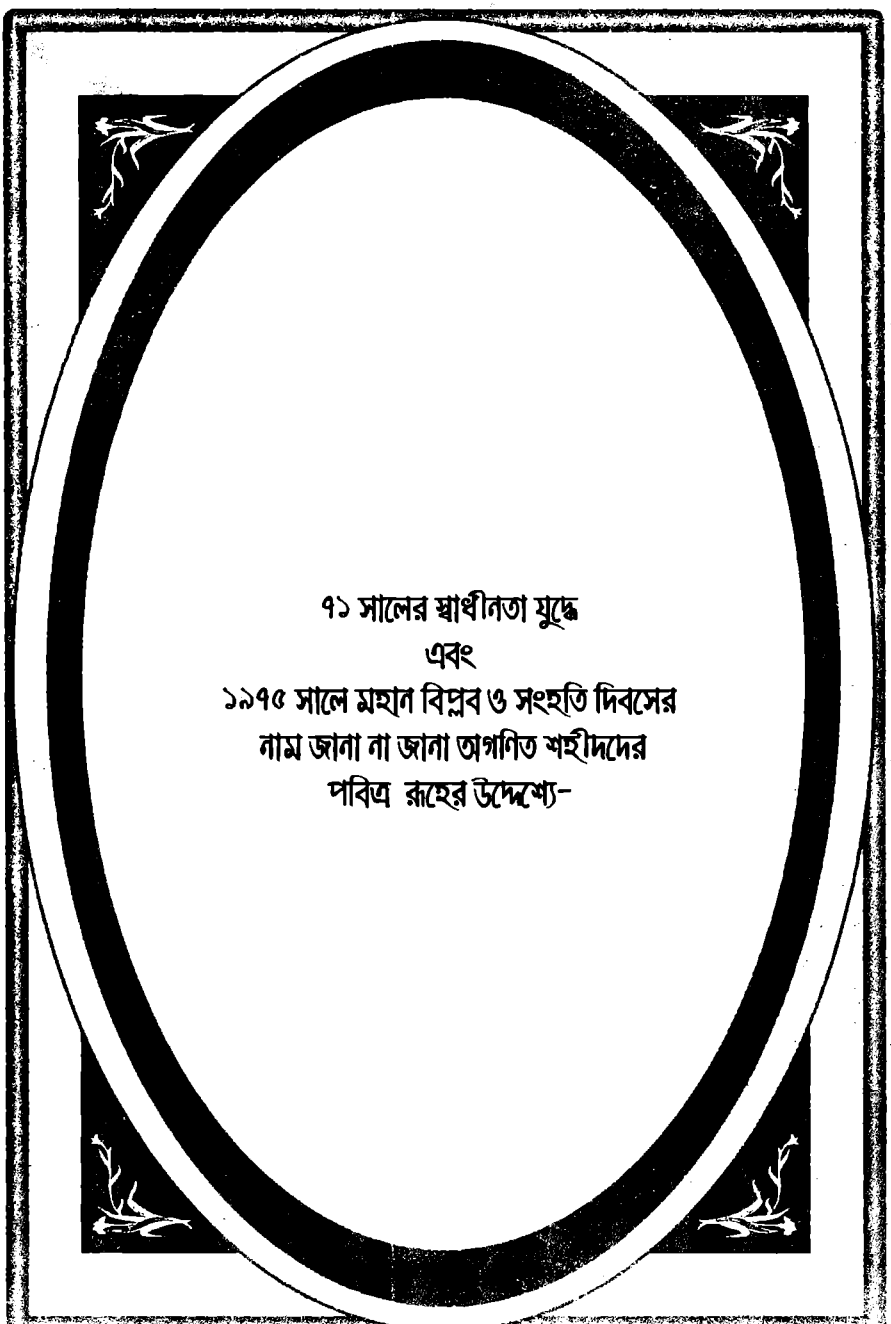

৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে
এবং
১৯৭৫ সালে মহান বিপ্লব ও সংহতি দিবসের
নাম জানা না জানা অগণিত শহীদদের
পবিত্র রূহের উদ্দেশ্যে-

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

- মুখবন্ধ ---------- ০৯
- সম্পাদকের কথা ---------- ১৩
- ঘরে-বাইরে ---------- ১৭
- পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট ---------- ২৩
- ইতিহাসের আলোকে নূরউল্লাহ'র জবানবন্দী -------- ৩৫
- উপসংহার ---------- ৫৯
- পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবনের কিছু খন্ডচিত্র ---- ৬৩
- সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ---------- ৮৫
- পরিশিষ্টঃ দফার রাজনীতি ---------- ৯১
- স্বাদেশিকতায় উজ্জীবিত জনগণের কাছে প্রশ্ন ------- ১১৩

www.pathagar.com

জনগণের আওয়াজই আল্লাহর আওয়াজ। দেশে দেশে যুগে যুগে জনসাধারণই রাজশক্তির উৎস ও স্নায়ু। জনগণের দাবীর ঝড়ের মুখে পৃথিবীর বহু স্বেচ্ছাচারী রাজার রাজছত্র আর পুঁজিপতি শোষকের আইন উড়িয়ে নিয়ে গেছে। এ বাণীর শক্তি চিরদিন অক্ষয়, অম্লান ও ভয়ঙ্কর।

-শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

বাংলা অভিধানে দু'টি শব্দ আছে। শব্দ দু'টি হলো 'আত্মপ্রকাশ' ও 'আত্মপ্রচার'। প্রত্যেক দেশের মহান ব্যক্তিরা সপ্রতিভায় গঠনমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে জাতির কাছে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে নিজেদেরকে বিকশিত করেন। এসব মহান ব্যক্তিরা দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই এঁদেরকে নিয়ে প্রতিটি জাতি অহংকার ও গৌরববোধ করে। এসব কৃতিমান পুরুষেরা নিজেদের চাওয়া-পাওয়াকে তুচ্ছ করে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সদা সচেষ্ট থাকেন। এঁরা নিজেদেরকে জাতির কাছে দায়বদ্ধ মনে করেন। এই দায়বদ্ধতা পালন করতে গিয়ে নিজেদের জীবনকে দেশ ও জাতির জন্য উৎসর্গ করেন। জাতির কাছে এঁরা কিছু প্রত্যাশা করেন না। কৃতজ্ঞ জাতির কাছে এঁরা যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় বরণীয় হয়ে থাকেন। ইতিহাসের পাতা থেকে এঁদেরকে মোছা যায় না। চিরকাল ইতিহাসের পাতায় স্বমহিমায় উদ্ভাসিত থাকেন। কিন্তু জাতির কাছে 'আত্মপ্রকাশ' সহজ কাজ নয়। নেই কোনো সংক্ষিপ্ত পথ। এর জন্য প্রয়োজন মেধা, প্রজ্ঞা, প্রত্যয়, সততা, মহানুভবতা, নিরপেক্ষতা, উদারতা, নির্লোভ, জাতীয়তাবোধ ও কঠোর সাধনা। সর্বোপরি অগাধ দেশপ্রেম। আর দেশপ্রেম এমন একটি দর্শন যা পরীক্ষা ছাড়া প্রমাণিত হয় না। আর দেশপ্রেমের পরীক্ষা এমন যে, ১০০-এর মধ্যে ৯৯ পেলেও উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। তাই এসব মহান ব্যক্তিরা চটকদার কথা বলে এবং চমকপ্রদ কাজ দেখিয়ে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের মাধ্যমে জাতিকে বিভ্রান্ত করতে পারেন না। তাঁরা সমাজে বা রাষ্ট্রে রাতারাতি সফলতা বা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন না। এর ফলে অসচেতন জাতির কাছে এঁদের সঠিক সময়ে সঠিক মূল্যায়ন হয় না। আর যখন এঁদের সঠিক মূল্যায়ন করা হয় তখন জাতির জন্য তা বড্ড দেরী হয়ে যায়। তখন আর কিছুই করার থাকে না। এর জন্য জাতিকে দিতে হয় চরম মূল্য।

আত্মপ্রচারে যারা বিশ্বাসী তাদের এসবের বালাই নেই। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে কিভাবে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায়, কিভাবে সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করা যায়, সত্যকে মিথ্যায়, মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করে কিভাবে সস্তা জনপ্রিয়তা ও সফলতা অর্জন করা যায় সেটাই থাকে তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তাই আত্মপ্রচারমুখী ব্যক্তিরা স্বীয় স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে বেছে নেয় প্রতারণা ও ধাপ্পাবাজীর কৌশল। এরা চটকদার কথা ও চমকপ্রদ কাজের মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করে রাতারাতি সমাজপতি বনে যায়। এই সব সমাজপতিরা নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য ব্যবহার করে অগাধ কালো টাকা ও পেশী শক্তি। এই কালো টাকা ও পেশী শক্তির মাধ্যমে এরা জিরো থেকে সহসাই হিরো বনে যায়। তখন এদের দাপটে বাঘে-মহিষে

www.pathagar.com

একঘাটে পানি খায়। এদের ক্ষমতার দাপট এবং গণবিরোধী কার্যকলাপে যখন জনগণ অতিষ্ঠ হয় তখনই দেখা দেয় তীব্র জনরোষ। এই জনরোষে অনেককেই ক্ষমতা থেকে খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বরণ করতে হয় ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিণতি। অথবা নিক্ষিপ্ত হয় ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। তখন এদের গালে চামচিকাও থাপ্পর মারে। এদেরকে জাতি অত্যন্ত ঘৃণার সাথে স্মরণ করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে জ্ঞানসাধক সক্রেটিসের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়।

আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে সক্রেটিসের জন্ম হয়। সে সময় গ্রীসের রাজাদের ছিলো দুর্দান্ত প্রতাপ। এরা কথায় কথায় মানুষকে কারাগারে পাঠাতেন, গর্দান নিতেন। সেকালে রাজারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করতেন। তাদের কথা মানেই ঈশ্বরের কথা। তাই রাজাও ঈশ্বরের মতো সম্মান পাবার যোগ্য মনে করতেন। কিন্তু সক্রেটিস বলতেন, না মানুষ কখনো ঈশ্বর হতে পারে না। সব মানুষই ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বরের কাছে রাজা এবং প্রজা সবাই সমান। সক্রেটিসের এই কথাগুলো অত্যাচারিত জনগণকে আকৃষ্ট করে। বিশেষ করে দেশের তরুণ সমাজ সক্রেটিসের এই আদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে। তরুণেরা দলে দলে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। আর এই ঘটনাই সক্রেটিসের বিপদ ডেকে আনে। রাজার স্তাবকেরা এই সংবাদ রাজার কানে দেয় এবং এই দার্শনিকের বিরুদ্ধে নানা দুর্নাম ও অপপ্রচার শুরু করে। অপপ্রচারের মাধ্যমে জনগণ ও রাজাকে তাঁর বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলে। রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে সক্রেটিসকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়ে দেন। একমাস পর তাঁর বিচারের নামে অনুষ্ঠিত হয় প্রহসন। আদালতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, যদি সক্রেটিস তাঁর রাজদ্রোহিতা থেকে বিরত থাকেন, যদি রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মেনে নেন, তাহলে তাঁকে ক্ষমা করা হবে। কিন্তু সক্রেটিস ছিলেন নির্ভীক ও সত্যদর্শী। তিনি বললেন, মিথ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা অধিকতর শ্রেয়। আমি যা সত্য বলে জানি, তাকে অস্বীকার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বিচারক বললেন, তবে মৃত্যুই তোমার একমাত্র শাস্তি।

তাই হোক। তবু সত্য বেঁচে থাকুক। অতঃপর তাই হলো। তিনি সত্যের জন্য হাসিমুখে রাজার আদেশ মান্য করে হেমলকের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন। মরেও সত্যের জন্য দীর্ঘ ২৫০০ বছর যাবত তিনি বেঁচে আছেন ইতিহাসের পাতায় অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে। কিন্তু অত্যাচারী রাজার নাম ইতিহাসে নেই। আর থাকলেও তাকে স্মরণ করা হয় অত্যন্ত ঘৃণার সাথে। আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস থাক। চলতি শতাব্দীতে আমাদের দেশে অনেক কৃতিমান পুরুষের জন্ম হয়েছে। এঁদের অনেকেই ছিলেন দেশ ও জাতির জন্য আত্মনিবেদিতপ্রাণ। কিন্তু তাঁরা সপ্রতিভায় আত্মপ্রকাশে বিশ্বাসী ছিলেন এবং চটকদার কথা বলে জাতিকে বিভ্রান্ত অথবা ফাঁকি দিতে পারেননি বলে রাতারাতি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি। একশ্রেণীর আত্মপ্রচারমুখী মতলববাজ রাজনীতিকদের চক্রান্তের কারণে ইতিহাসে তাঁরা গৌরবজনক আসনটি আজো পাননি। এসব রাজনীতিকদের কারো কারো মুখোশ ইতোমধ্যেই

www.pathagar.com

জনগণের কাছে উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু এখনো যাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়নি, এখনো যারা জাতির কাছে হিরো হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে বোধ হয় সেদিন আর বেশী দূরে নয়, তাদের মুখোশও উন্মোচিত হবে।

ইতিহাসের তিনটি বাঁক জাতি অতিক্রম করেছে। এই বাঁক পরিবর্তনে জাতিকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। কিন্তু কতিপয় অপরিণামদর্শী রাজনৈতিক নেতাদের কারণে অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা কোন সুফল বয়ে আনেনি। এই জাতির দুর্ভাগ্যের অবসান হয়নি। দুর্ভাগ্যই যেন জাতির জন্য স্থায়ী ললাট লিখন।

একটি আত্মনির্ভরশীল সমৃদ্ধ জাতির নিয়ামক শক্তি হলো (১) ভৌগলিক স্বাধীনতা (২) রাজনৈতিক স্বাধীনতা (৩) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও (৪) সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। দুঃখজনক হলেও সত্য গত ৩১ বছরে বহু রক্ত ঝরিয়েও উল্লেখিত চারটি নিয়ামক শক্তি জাতি অর্জন করতে পারে নাই। ১৯০ বছরের অনেক সংগ্রাম ও ত্যাগ তিতিক্ষার ফসল ১৯৪৭ সালের সীমানা মানচিত্রে থাকলেও বাস্তবে নেই। হাজার হাজার একর জমি এখন ভারতের দখলে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার অস্তিত্ব আমরা কাগজে-কলমে দেখি, বাস্তবে নেই। বিদেশীরা আমাদের ডিক্টেট করে। গণতন্ত্রের নামে কয়েক লক্ষ লোকের যা ইচ্ছে করার সুযোগ হলেও কোটি কোটি লোক গণতান্ত্রিক সুযোগ থেকে শুধু বঞ্চিত নয় বৃহৎ রাজনৈতিক দলের আশির্বাদপুষ্ট সন্ত্রাসীদের দাপটে অসহায় ও জিম্মি। নেতা-নেত্রীরা বিদেশীদের কাছে হরতাল করবে না এবং সংসদ বর্জন করবে না বলে ওয়াদা করে। কিন্তু জাতির কাছে এ বিষয়ে কোন অঙ্গীকার নেই। নির্বাচন এলে এইসব নেতা-নেত্রীরা জনগণের কাছে ভোটের ভিক্ষা করে। আর নির্বাচনের পর ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বিদেশী পরাশক্তিকে তোয়াজ করে। এ দেশীয় কতিপয় বুদ্ধিজীবী নামে বৃত্তিজীবী গাছ কাটার বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য রাস্তায় নেমে পড়ে। অথচ মানুষকে হত্যা করে টুকরো টুকরো করে ড্রেনে ফেলে দিলেও তাদের বিবেক দংশিত হয় না। বৃটিশ ও পাকিস্তানী আমলে আমাদেরকে দরিদ্র করে রেখেছিলো। কিন্তু ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত করতে পারেনি। বর্তমানে আমাদের দেশের নেতা-নেত্রীদের সেবার ঠেলায় আমরা ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত হয়েছি। শতকরা ৮০ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থান করছে। উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড এদেশের নীতি নির্ধারকেরা নিতে পারে না। আই.এম.এফ, বিশ্বব্যাংক প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী তথাকথিত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অনুৎপাদনশীল খাতে খরচের ফলে প্রতি বছর জাতির ঘাড়ে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণের বোঝা চাপছে; আর অন্যদিকে মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে ভারী শিল্প কারখানাগুলো স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দাতাগোষ্ঠিগুলো আমাদেরকে হাঁস-মুরগী মাছ চাষ করে ভাগ্য ফিরানোর নসিয়ত করছেন। হাঁস-মুরগী, ছাগল-ভেড়া ও মাছ চাষ করে ভিক্ষাবৃত্তি রোধ করা যায়। কিন্তু জাতির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটানো যায় না। এক কথায় আমাদের অর্থনীতিকে ফুলের টবের ন্যায় বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। অর্থনীতিকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়ানোর জন্য

www.pathagar.com

মাটিতে শিকড় গজাতে দিচ্ছে না। আর অন্যদিকে একদল সংস্কৃতিসেবী প্রগতি ও বাঙ্গালীত্বের নামে আমাদেরকে হাজার বছর আগে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। আরেক দল পশ্চিমা বেলেল্লাপনা সাংস্কৃতিক চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে।

দার্শনিক বেনেট কার্ক বলেছেন, রাজনীতিবিদেরা যেন জাহাজ– কুয়াশার মাঝে পড়লেই হাঁকে-ডাকে আর্তনাদে সকলকে সচকিত করে তোলে। যেমনি করে ছিলেন ১৯৭০ সালে জনাব মুহাম্মদ নূরউল্লাহ। অগাধ দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয়ে প্রতিকূল অবস্থা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও সাহসের সাথে সে দিন যে বক্তব্য তুলে ধরে জাতিকে গণতন্ত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছিলেন তা আজ সত্যে পরিণত হয়ে এর কাফফারা ও খেশারত সমগ্র জাতি দিয়ে যাচ্ছে।

আরেক দার্শনিক টমাস মূর বলেছেন- যারা মুখোশ পরে দেশের সেবায় এগিয়ে আসে, তারা সবচেয়ে বড় দেশদ্রোহী। এইসব তথাকথিত দেশপ্রেমিকদের আজ থেকে ৩১ বছর আগে নূরউল্লাহ যে স্বরূপ উন্মোচিত করেছিলেন দেশের অধিকাংশ মানুষ উপলব্ধি করতে না পারলেও সুযোগসন্ধানী দৈনিক পত্রিকার সন্ধানীরা তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ব্যক্তি নূরউল্লাহকে গুরুত্ব না দিলেও তার বক্তব্য যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো প্রকাশিত বিরাট উপ-সম্পাদকীয়তে এর যথার্থ প্রমাণ মেলে। শব্দের বিলাসিতায় কথার ফুলঝুড়ি দিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে জনাব নূরউল্লাহ'র বিরুদ্ধে যে সব অপপ্রচার করা হয়েছিলো তা আজ মিথ্যায় পরিণত হয়েছে।

পরিশেষে দেশবাসীর কাছে আমার নিবেদন এই যে, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এই দেশকে ধ্বংস করতে যে সব বিদেশী রাজনৈতিক ঠিকাদারেরা সক্রিয়– এদের কবল থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হবে। নইলে আগামীতে জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব থাকবে না। পরগাছা জাতি হিসাবে আমরা বেঁচে থাকবো।

'ইতিহাসের বাঁকে মুহাম্মদ নূরউল্লাহ' পুস্তকটি অনেকের কাছে 'চর্বিত চর্বন' বা 'পুরানো কাসুন্দি' মনে হলেও নতুন বংশধরদের কাছে তথাকথিত স্বাধীনতাপক্ষের দাবীদার রাজনৈতিক দলের দর্শন সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং মিথ্যার ঝুলি থেকে সত্যকে ছেঁকে বের করার জন্য কিছুটা হলেও সহায়ক হবে এবং ইতিহাসের অনেক উপাদান পাবে। এছাড়া গ্রন্থটি আমাদের জাতীয় জীবনে আগামী বংশধরদের জন্য একটি মূল্যবান দলিল হিসাবে বিবেচিত হবে বলে আমি আশা রাখি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

মুনাওয়ার আহমদ
সভাপতি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা।

৫ নভেম্বর, ২০০১

www.pathagar.com

সম্পাদকের কথা

এককালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খানকে ঘৃণা করতাম। কিন্তু বর্তমানে তাঁকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করি। কেন শ্রদ্ধা করি এই প্রশ্নের জবাব এই সীমিত পরিসরে বিস্তারিতভাবে দেয়া সম্ভব নয়। শুধু একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত জবাব দিতে চাই।

ষাট দশকের শেষের দিকে তেজগাঁও এয়ারপোর্টে বর্তমান গণতন্ত্র প্রেমিকেরা মোনায়েম খানের মাথা থেকে পরিধেয় টুপিটি ফেলে দিয়েছিলো। এরপর তাঁর সম্মুখে টুপিটি নিয়ে ফুটবল খেলার মতো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঠাট্টা মশকরা করেছিলো। এরূপ অবমাননাকর পরিস্থিতিতেও তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন। কিন্তু এই অবস্থা যদি বর্তমান তথাকথিত গণতান্ত্রিক কোন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীর সাথে ঘটতো তা হলে এর পরিণাম কি হতো বলাই বাহুল্য। এইসব তথাকথিত গণতন্ত্র প্রেমিকদের বিরুদ্ধে জনাব নূরউল্লাহসহ অনেক দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতার সংগ্রাম ছিলো; দেশ বা জাতির বিরুদ্ধে নয়। দার্শনিকেরা বলে থাকেন- সব লোককে কিছু সময়ের জন্য প্রতারণা করা যায়। কিন্তু সব সময়ের জন্য নয়। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দৃশ্যমান।

এক সময় হ্যামিলনের বংশীবাদকের ন্যায় তথাকথিত গণতন্ত্রের ডুগডুগি বাজিয়ে এদেশের জনগণকে কতিপয় নেতা সম্মোহিত করেছিলো। এর সর্বনাশা পরিণাম সম্পর্কে যারা সচেতন ছিলো তারা দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলো। এর মধ্যে জনাব নূরউল্লাহও একজন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা ছিলো তখন হাতে গোনা।

জনাব নূরউল্লাহ এর সাথে আমার পরিচয় বছর তিনেকের। অন্তরঙ্গভাবে মেশার সুযোগ হয়নি। তবে এই তিন বছরে তাঁর নীতি আদর্শ ও বিশ্বাস সম্পর্কে যতটুকু পরিচয় পেয়েছি আমি ব্যক্তিগতভাবে অভিভূত হয়েছি। সাংবাদিকতা ও প্রকাশনা শিল্পে চাকুরীর সুযোগে বহু বিখ্যাত লেখক, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবীর সাথে আমার পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য এর মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া নির্ভেজাল ও খাঁটি দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্বের সন্ধান আমি পাইনি। অনেকেই হালুয়া-রুটির লোভে নিজের আদর্শ-নীতি বিসর্জন দিয়ে অন্যায়ের সাথে আত্মসমর্পণ করেছে। এর ব্যতিক্রম আমি লক্ষ্য করেছি জনাব নূরউল্লাহর কর্মজীবনে। তাঁর আচার-আচরণে, চিন্তা-চেতনায় এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদেও স্বীয় নীতি বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হননি। এর ফলে তাঁর প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধাবোধ জন্মেছে।

সম্প্রতি ১৯৭০ সালে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি উপ-সম্পাদকীয়-এর ফটোকপি তিনি আমাকে পড়তে দেন। উক্ত উপ-সম্পাদকীয়তে জনাব নূরউল্লাহের বিরুদ্ধে নানা উপমা, দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বিষোদ্গার করা হয়েছে। কলামিস্ট 'সন্ধানী' জনাব নূরউল্লাহকে একজন অখ্যাত রাজনৈতিক নেতা বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ এই অখ্যাত একজন রাজনৈতিক নেতার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় পত্রিকায় একটি বিরাট উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হওয়া আমাকে বিস্মিত করেছে।

ছাত্রজীবনে আমার একজন শিক্ষক আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন-"প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যদি তুমি কোন কাজ কর এবং এই কাজের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ থেকে যদি কোন বাধা না আসে তাহলে তুমি মনে করবে তোমার কাজটি ঠিক মতো হচ্ছে না। আর যদি বাধা আসে তাহলে মনে করবে কাজটি তুমি যথার্থভাবে করে যাচ্ছ।" ঠিক ষাট দশকের শেষের দিকে জনাব নূরউল্লাহ যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তা ছিলো যথার্থ। তাঁর বক্তব্যে এই অশুভ শক্তির মন ও মগজে তখন জ্বালা ধরে গিয়েছিলো।

www.pathagar.com

সুযোগ সন্ধানী কলামিস্ট "সন্ধানী" তাঁর দীর্ঘ নিবন্ধে নুরউল্লাহদেরকে গণতন্ত্রের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে শোষণের অনেক উপমা দিয়ে শব্দের মালা গেঁথেছেন। কিন্তু গত ৩১ বছরে কারা গণতন্ত্রের বারোটা বাজিয়ে সীমাহীন শোষণ এবং বিদেশীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে এদেশকে নরকের রাজ্যে পরিণত করেছে তা আজ সন্ধানীরা টের না পেলেও জনগণ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

এদেশের জনগণ ১৭৫৭ সালের পর প্রতিটি স্বাধিকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট থেকে সাফল্যের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলনের ফসল সুবিধাবাদী রাজনৈতিক চক্র জনগণকে ভোগ করতে দেয়নি। জনগণ যেন আবারো এইসব সুযোগসন্ধানী ও বিবেকহীন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের খপ্পরে না পড়েন এবং দেশ ও জাতির কারা শত্রু; কারা মিত্র সে ব্যাপারে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে 'ইতিহাসের বাঁকে মুহাম্মদ নূরউল্লাহ' বইটি সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছি।

৪৭ সালে পূর্ব বাংলার মুসলমানেরা ইসলামের চেতনায় পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে। '৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানীদের অর্থনৈতিক শোষণ আর ঔপনিবেশিক ধাঁচের শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধ কোনভাবেই ইসলামের বিরুদ্ধে ছিল না। এদেশের জনগণ পাকিস্তানের শোষণ-শাসনমুক্ত হয়ে ভারতের শোষণ ও তাঁবেদারীর শিকার হতে চায়নি। অথচ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতের দালাল আওয়ামী পুতুল সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে প্রথম আঘাতই করেছিল ইসলামের উপর এবং দেশকে ভারতের তাঁবেদার বানাবার ষোলআনা ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিল, ২৫ সালা গোলামী খত তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশকে ঘোষণা করেছিল ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে। পাকিস্তানীদের পরাজয়কে ইসলামের পরাজয় হিসাবে দাঁড় করানোর হেন চেষ্টা নাই যা বাকী ছিল। এদেশের জনগণ যদি ইসলামকেই বিসর্জন দেবে তাহলে '৪৭ সালে বাংলা বিভক্ত করার কোন প্রয়োজনই পড়তো না। এ সত্যকে উপলব্ধি করতে না পেরেই স্বাধীনতা পরবর্তী পুতুল সরকার ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মনঃতুষ্টি আর প্রভুভক্ত গোলাম হিসাবে স্বীকৃতি লাভের প্রত্যাশায় জনগণের চেতনার মর্মমূলে আঘাত হানে। একথা আজ দৃঢ়তার সাথেই বলা যায় আওয়ামী সরকারের এই সিদ্ধান্ত ছিল জনগণের বিশ্বাস আর আত্মচেতনার মূল সত্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল এবং সেদিনই আওয়ামী সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে একটি পতনশীল বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। আর সে পতন চূড়ান্ত হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক ১৫ আগষ্ট তারিখে।

স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান ২৫ বছরের গোলামী চুক্তি সম্পাদন করেন। ঘোষণা করেন বাংলাদেশ চারটি খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত হবেঃ (১) গণতন্ত্র (২) সমাজতন্ত্র (৩) ধর্মনিরপেক্ষতা ও ৪। জাতীয়তাবাদ। সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী বাবুরা আওয়ারা হয়ে মাঠেঘাটে চোঙ্গা ফুঁকাতে থাকেন-'বিশ্বে এলো নতুন বাদ, মুজিববাদ মুজিববাদ'। এর মাধ্যমে জনগণের চেতনা অর্থাৎ ইসলামী বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে যে জবাই করে 'বাদ' দেয়া হয়েছে সে 'বাদ'-এর কথা চোঙ্গা পার্টিরা মোটেও মালুম করতে পারেন নাই। এরপর কথিত মুজিববাদের পয়লা নম্বর ছবক গণতন্ত্রের অবাধ স্বাধীনতার বলে বলীয়ান হয়ে আওয়ামীপন্থীদের মাঝে নানা প্রকার লাল-নীল বাহিনী গজিয়ে ওঠে। সরকারী ছত্রছায়ায় তৈরী হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোশাকের আদলে রক্ষীবাহিনী, চলে বিরোধী দল ও বিরুদ্ধমতের কর্মীদের উপর জুলুম, নির্যাতন, হত্যা, গুমসহ হাজারো রকম মুজিববাদী গণতান্ত্রিক কান্ডকীর্তি। জনগণ অসহায়ভাবে মুজিববাদী গণতন্ত্রের নমুনা দেখেছে। তারা গণতন্ত্রের নামে নির্লজ্জের মত রাজপথে বলেছিল– একনেতা একদেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ। অসহায়ভাবে মানুষ এই গণতন্ত্রের শ্লোগান শুনেছে। পনরই আগষ্ট বিপ্লবের পর সেই জনগণই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তির আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। মূর্খ ও রাজনীতি বোঝে না এমন মানুষদেরও দেখা গেছে আনন্দ উল্লাসে একজন অন্যজনের উপর ঢলে পড়েছে এবং পাল্টা শ্লোগান বলেছে– এক নেতা এক দেশ, এক রাতে সব শেষ।

www.pathagar.com

মুজিববাদের ২ নম্বর ছবক সমাজতন্ত্রের নামে শুরু হয় কম্বল চুরি, রিলিফের মালামাল লুটপাট, শিল্প প্রতিষ্ঠানের কলকব্জা খুলে নিয়ে ট্রাকে ট্রাকে ভারতে পাচার। এরপর বিদেশী খাদ্যের জাহাজ কলকাতা বন্দরে ভিড়িয়ে দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে শেখ মুজিবের অমর প্রতিশ্রুতি 'দেশে গরিব রাখবো না' কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রয়াস চালানো হয়। সমাজতন্ত্রের নামে আওয়ামী লীগের একজন ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতা সাড়ে তিন বছরে যে অর্থ লুটপাট করেছে আগামী চার পুরুষেও তা খরচ করে শেষ করতে পারবে না। দেশের সিংহভাগ ব্যাংক, বীমা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও দোকানপাটের মালিক আজ তারাই। এদের সমাজতন্ত্রী রাজনৈতিক দর্শনের মর্মকথাই ছিল – উলটপালট করে দে মা (ভারতমাতা), লুটেপুটে খাই।

মুজিববাদের ৩ নম্বর ছবক ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলামের শাশ্বত চেতনাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারার উপক্রম করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে 'রাব্বী জিদনী ইলমা' উঠিয়ে দেয়া হয়। কবি নজরুল ইসলাম কলেজের নাম থেকে 'ইসলাম' শব্দটি উঠিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র কবি নজরুল কলেজ বানানো হয়। বিসমিল্লাহ্, খোদা হাফেজ, আল্লাহু আকবর, জিন্দাবাদ প্রভৃতি ইসলামী শব্দ ও ধ্বনিকে ঘৃণাভরে মুছে ফেলা হয়। ইতিহাস সাক্ষী, ইসলামকে উৎখাত করার অপচেষ্টা চালিয়ে, ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে 'মুজিববাদ' নামক এই অশুভ ধ্বনিটি শুধুমাত্র ইসলামপন্থীদের কাছ থেকেই প্রত্যাখ্যাত হয় নাই, পঁচাত্তরের পর থেকে চলতি দু'হাজার এক সালের দীর্ঘ ছাব্বিশ বছরে খোদ মুজিব অনুসারীদের মুখেও একবার উচ্চারণ শোনা যায় নাই।

মুজিববাদের ৪ নম্বর ছবক জাতীয়তাবাদের নামে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবধারাকে প্রতিষ্ঠিত করার সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয়। এক ডাক্তার এক পেটের পীড়ার রোগীকে গ্লুকোজ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু রোগীর মূর্খ অভিভাবক গ্লুকোজকে মনে করলো গরুর গোস্ত। সে রোগীকে গরুর গোস্ত খাইয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল। ঠিক তেমনই সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ ছিল রোগীর মতই নিস্তেজ। ভারতীয় ভুল প্রেসক্রিপশনে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সুপথ্য ত্যাগ করে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ গেলাতে গিয়ে আওয়ামী-বাকশালী অভিভাবক, রোগী বাংলাদেশকে ব্রাহ্মণ্যবাদী ও নাস্তিক্যবাদী দর্শনের দিকে তথা জাতিকে ঈমান আকিদা ও অস্তিত্ব ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের এই কুপথ্যের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সৃষ্টি হয় সংকট ও অশান্তির সূচনা। যে কাফ্ফারা জাতিকে আজ পর্যন্ত সুদে – আসলে পরিশোধ করতে হচ্ছে।

জাতীয়তাবোধ থেকে জাতীয়তাবাদের জন্ম। শেখ মুজিবের জাতীয়তাবোধের আরো একটি নমুনা হচ্ছে তিনবিঘা করিডোরের বিনিময়ে তিনি বেরুবাড়ী ইউনিয়ন ভারতের কাছে এমনভাবে হস্তান্তর করেন যে, বাংলাদেশ যেন তার পৈত্রিক সম্পত্তি। এ ব্যাপারে জনগণের সম্মতি বা অনুমতির কোন ধার ধারেননি তিনি। অথচ মুজিবের সময়েতো দূরের কথা আজ পর্যন্ত সেই তিনবিঘা জমির উপর বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ সম্পর্কে অনেক সচেতন নাগরিকের মন্তব্য হচ্ছে, এক বিন্দু রক্ত থাকতে একজন কৃষক তার জমির এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়তে চায় না। কিন্তু কৃষকের ঘরের ছেলে মুজিব ভারতপ্রেমে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, পুরো দেশটাই ছেড়ে দেয়া তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

মুজিবের জীবনের সর্বশেষ স্বপ্ন ও অলীক দর্শন 'বাকশাল' কর্মসূচী এবং মুজিব ভক্তদের তোষামুদীর সর্বোচ্চ খেতাবী দর্শন 'মুজিববাদ' এই দুই শব্দই আজ সার্বিকভাবে এবং সর্বত্র পরিত্যক্ত। আজকের মুজিবভক্ত ও অনুসারীদের কাছেই তা লজ্জাকর বিবেচিত হয় এবং সংগত কারণেই তা মুখে আনার উপযোগিতা হারিয়েছে। পাশাপাশি ইসলাম ধর্ম, ইসলামী মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও আচার-আচরণ আল্লাহ্র অশেষ রহমতে জনগণের হৃদয়-মন জুড়ে বহাল তবিয়তেই টিকে আছে, ইনশাআল্লাহ টিকে থাকবেও অনন্তকাল।

এদেশের মানুষ বড়বেশী স্বাধীনতাপ্রিয়। মুঘল শাসনামলে যখনই সুযোগ পেয়েছে বাংলাকে স্বাধীন ঘোষণা করেছে, শুধু তাই নয় চারশত বছর মুঘলামলের অধিকাংশ সময়ই বাংলা স্বাধীন থেকেছে। এ জাতির প্রত্যয়ের সাথে 'স্বাধীনতাবোধ'টি বড় নিবিড়ভাবে

www.pathagar.com

জড়ানো। অথচ এই স্বাধীনতাপ্রিয় জাতিটির স্বাধীনতা হননের জন্য কত অপপ্রয়াসই না চলছে। একদল স্বার্থান্ধ পরজীবী মানসিকতার সুবিধাভোগী ও লোভী মানুষ দেশের আলোবাতাসে বেড়ে উঠা দুধকলাগ্রাসী সর্পের মত আমাদের স্বাধীন অস্তিত্বে ছোবল হানার সুযোগ খুঁজছে। এদের ধারণা ৪৭ সালের সীমানা বিভাজন ভুল ছিল। অথচ এরাই আবার স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি সাজতে চায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বুলি আওড়ায়। এদের চেতনার পুতুল যে দিল্লীর চাবি ঘোরানোতে নাচে এদেশের মানুষ তা ভালভাবেই জেনে গেছে।

অতএব নানা রঙ্গের চেতনা আমদানীকারকদের বোঝা উচিৎ এদেশের জনগণের অস্থিমজ্জা আর চেতনার সাথে যে ইসলাম মিশে আছে তা কখনও ছেলেভোলানো মোয়া দেখিয়ে মুছে ফেলা যাবে না। তাই ধর্মদ্রোহী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তার ধারক-বাহকদের স্মরণ রাখা দরকার যে ইসলামী চেতনার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর অর্থ নিজেদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার বন্দোবস্ত করা।

এদেশের জনগণ ভারতের সরকার ও নীতিনির্ধারকদের শুভবুদ্ধি কামনা করে। সৎপ্রতিবেশী ও বন্ধুভাবাপন্ন আচরণ নিয়ে এগিয়ে এলে জনগণ স্বাগতঃ জানাবে। কিন্তু কোন প্রকার অহেতুক ভয় দেখানো, অবিবেচক চাপ সৃষ্টি, হুমকি প্রদান করতে থাকলে কোনদিনই ভারত সফল হতে পারবে না। ভারতের উদ্দেশ্যে পরিশেষে দুটি কথা – এক, বিশ্ব পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে এবং দুই, স্বাধীনতাকামী জনগণকে পদানত করা গেছে, এমন নজীর দুনিয়ার ইতিহাসে নাই।

সুতরাং জনাব নূরউল্লাহ-এর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে ইতিহাসের আলোকে জোরালো বক্তব্য দিয়ে সে সব অভিযোগ খন্ডিত হয়েছে "ইতিহাসের বাঁকে মুহাম্মদ নূরউল্লাহ" গ্রন্থে। নানা মূল্যবান অজানা তথ্য, তত্ত্ব, উপাত্ত ও ইতিহাসের উপকরণে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার সন্ধিক্ষণে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের সহায়তা করবে এ বিশ্বাস আমার রয়েছে।

সবশেষে বইটি প্রকাশিত হওয়ায় আল্লাহপাকের দরবারে জানাই লাখো কোটি শুকরিয়া। জনাব নূরউল্লাহর তৎকালীন রাজনৈতিক ভূমিকা ছিলো দেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতায় উদ্বেলিত ও উজ্জীবিত, কিন্তু সন্ধানীরা নানা কল্পকাহিনীর মাধ্যমে অনেককে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। এই ইতিহাস বিকৃতির দায় থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। নূরউল্লাহর তৎকালীন রাজনৈতিক ভূমিকাও সঠিক ছিলো গত ৩১ বছরের ইতিহাসই প্রত্যক্ষ সাক্ষী। বর্তমান বংশধরদের বিভ্রান্তি নিরসনে অসংখ্য দৃষ্টান্ত ও জোরালো বক্তব্য এই বইয়ে সংযোজিত হয়েছে।

মুদ্রণ এবং প্রকাশনার কাজে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন সর্বজনাব ইঞ্জিনিয়ার মুনাওয়ার আহমদ, বেনাউল ইসলাম, আ.জ.ম. শামসুল আলম, মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন খান, এ.টি.এম. ফজলুল হক, এন.এম. হাবিবউল্লাহ, আবদুল ওয়াহিদ, জিয়া হাবীব আহসান, মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন, আখতারুজ্জামান, এডভোকেট শফিক আহমদ, তোফাজ্জল হোসেনসহ আরো অনেকে।

বানান বিভ্রাট পাঠকদের পীড়াদেয়। এর প্রতি লক্ষ্য রেখে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে। এছাড়া সম্মানিত পাঠকদের কাছে কোন তথ্য ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানালে আগামী সংস্করণে বানান বিভ্রাটসহ তথ্যগত ভুল সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

৫ নভেম্বর, ২০০১ — সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ

www.pathagar.com

জনাব নূরউল্লাহ'র বিরুদ্ধে ৩১ বছর আগে তথ্যসন্ত্রাস

ঘরে-বাইরে

সন্ধানী

[উপ-সম্পাদকীয় কলাম থেকে]

দৈনিক ইত্তেফাক ২-২-১৯৭০

পি-ডি-পি'র প্রাদেশিক সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল্লাহর উর্বর মস্তিষ্ক হইতে এক উদ্ভট আবিষ্কার কাহিনী প্রকাশ পাইয়াছে। স্বীয় করোটিতে সে চিন্তা লালন করিয়া বিকারানন্দে সন্তুষ্ট থাকিলে কাহারও আপত্তি করার কিছু ছিল না। কিন্তু চট্টগ্রামের দোহাজারীতে জনসভা ডাকিয়া তাহাদের নিকট উহা প্রকাশ করিয়াই ফ্যাসাদ বাধাইয়াছেন। তিনি "সন্ত্রাস ও নয়া ফ্যাসীবাদী কার্যকলাপ" এবং "আঞ্চলিকতার প্রতারণামূলক শ্লোগানগুলি" সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া সম্প্রতি পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের "বিরাট জুয়াখেলায়" কোথা হইতে "আড়াই লক্ষ টাকা" ব্যয় হইয়াছে, তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। গরজে পাগল মস্তিষ্কবান মোহাম্মদ নুরুল্লাহ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, "আওয়ামী লীগ বাইশ-পরিবারের একমাত্র এজেন্ট"। তিনি "বাইশ পরিবারের একমাত্র এজেন্টের" কার্যকলাপের প্রতি সতর্ক থাকার আহবান জানাইয়া "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের" খেলায় "পশ্চিম পাকিস্তান হইতে এই এলাকাকে পৃথক করার জন্য তাহাদের অর্থ জোগাইতেছে" বলিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন।

চট্টগ্রামের দোহাজারী হইতে উপরোক্ত আবিষ্কার কাহিনী ও সাবধানবাণী নিক্ষেপ করিয়া মোহাম্মদ নুরুল্লাহ অতঃপর সদলবলে আবার কোথায় কোন্ নূতন আবিষ্কার কাহিনী বয়ান করিতে ছুটিয়াছেন, আমাদের তাহা জানা নাই। আর সত্যি করিয়া বলিতে গেলে তাহাদের কথা জানিবার তিলমাত্র ইচ্ছাও কাহারও নাই। মোহাম্মদ নুরুল্লাহ এমন কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সমর্থক নন কিংবা দেশের রাজনীতিতে তাঁহার নিজের এমন কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনদিন ছিল না বা আজও নাই যে, তাহার খোঁজ-খবর লওয়ার প্রয়োজন বোধ হইতে পারে। অক্ষমের আস্ফালন যেমন এদেশবাসী অনেক শুনিয়াছে, তেমনি গরজে-পাগল মস্তিষ্কবানদের উদ্ভট আবিষ্কারের কাহিনীও নেহাত কম শোনা যায় নাই। শুনিতে শুনিতে ইহাদের মানস-চেহারাটা জন সাধারণের কাছে এমন নগ্নভাবে ধরা পড়িয়া গিয়াছে যে, এই ধরনের আস্ফালন ও আচরণ দেখিয়া মানুষ কেবল করুণা-মিশ্রিত দৃষ্টি নিক্ষেপই করে না, অনেকের মনে পাবনার হেমায়েতপুরের ছবিও ভাসিয়া উঠে। এদেশবাসী এই গরজে-পাগল মস্তিষ্কবানদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারিত, যদি না অক্ষমের পশ্চাতে থাকিত

www.pathagar.com

সক্ষমের স্বার্থের খেলা ও সক্রিয় সমর্থন।

সকলেই জানেন, পাকিস্তান আন্দোলনের আদর্শ ছিল একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা। অবাধ গণতান্ত্রিক অধিকার লইয়া বাঁচিয়া থাকিবার অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষাতেই হাজার হাজার মানুষ আত্মত্যাগ করিয়াছিল। পাকিস্তান অর্জিত হয় নিয়মতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক পথেই। পরিতাপের বিষয়, প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের জন্য আত্মদানের সেই লক্ষ্য অর্জিত হয় নাই। যে গণতান্ত্রিক পন্থায় অর্জিত পাকিস্তানকে গণতান্ত্রিক আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করাই ছিল আত্মত্যাগের মূল প্রেরণা, উহা বিঘ্নিত হওয়ার ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক হইলেও ইহার কারণ কিন্তু মোটেই দুর্বোধ্য নয়। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে দেশ হইতে গণতন্ত্র বিদায় লইয়াছে প্রায় এক যুগ পূর্বে। কোন দেশে যখন গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করিয়া উহার উপর স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন সবচাইতে বেশী উপকৃত হয় কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিস্বার্থে অন্ধ পদলেহী ব্যক্তিরা। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি চরম ব্যাপকতা লাভ করে। গণতান্ত্রিক শাসন সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত, এমন কথা নিশ্চয় বলা চলে না। কিন্তু তবু গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সমালোচনার অধিকার অবাধ থাকায় কোথাও কোন দুর্নীতি ঘটিলে উহার তীব্র সমালোচনা হয়। ফলে জনমতের চাপেই দুর্নীতির আশঙ্কা কমিয়া যায়। কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে সমালোচনার অধিকার নাই এবং সেই জন্যই কায়েমী স্বার্থবাদী ও তাঁবেদারী মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাহাদের স্বার্থোদ্ধারের যাবতীয় সুযোগ পায়। গণতন্ত্রের নামে সেই সব লোক সেজন্যই আতঙ্কগ্রস্ত এবং গণতন্ত্রের কিছুমাত্র অঙ্কুরোদগমের সম্ভাবনা জাগরিত হওয়া মাত্রই ইহারা নানা ছলে, নানা কৌশলে উহাকে পিষিয়া মারিতে সচেষ্ট হইয়া উঠে। দুর্ভাগ্যক্রমে বিঘোষিত গণতান্ত্রিক আদর্শ পাকিস্তান আন্দোলনের প্রেরণা হইলেও পাকিস্তানের মাটিতে গণতন্ত্র শিকড় মেলিতে পারে নাই এবং ইহা বিশেষতঃ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য। আর দেশের এই পরিতাপজনক পরিস্থিতিই রাজনীতি ক্ষেত্রে মোহাম্মদ নূরুল্লাহদের মত লোকের প্রাদুর্ভাবের হেতু।

মোহাম্মদ নুরুল্লাহ জনসাধারণের নিকট হইতে পি-ডি-পি'র প্রতি সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে আরণ্যিক হিংস্রতা লইয়া আওয়ামী লীগের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু পি-ডি-পি ওয়ালাদের দুর্ভাগ্য যে, জনসাধারণকে যত বোকা তাঁহারা ঠাওরাইয়াছেন, আসলে জনসাধারণ ততটা তো পরের কথা, আদৌ বোকা নয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে 'প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের' রাজনৈতিক জুয়াখেলা খেলিয়া কাহারা দেশে স্বৈরশাসন কায়েমের পথ সুগম করিয়াছিল, কাহারা পূর্ব পাকিস্তানকে সীমাহীন বৈষম্য-বঞ্চনার শিকারে পরিণত করার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করিয়াছে এবং এখনও পশ্চিম পাকিস্তানের হাটে-মাঠে ঘাটে যে "ফেজ টুপি আর শেরোয়ানীওয়ালারা" পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণ এবং তাহাদের বাঁচামরার দাবী পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের উগ্র বিরোধিতা করিয়া বেড়াইতেছে, পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত বিষাইয়া তোলার জন্য আদাজল খাইয়া চেষ্টা করিতেছে, তাহারা কাহারা, তাহাদের পরিচয় কি, কোন্ রাজনৈতিক দলের তাহারা নেতা এবং পাকিস্তান আন্দোলনে তাহাদের ভূমিকা কি ছিল, জনসাধারণ তাহা ভালভাবেই জানে। জনসাধারণ ইহাও জানে, বায়ান্নর ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে আওয়ামী লীগ, না

www.pathagar.com

মোহাম্মদ নুরুল্লাহদের মুরুব্বীরা গুলীবর্ষণ করিয়া তরুণের তপ্ত রক্তে ঢাকার রাজপথ রক্ত-রঞ্জিত করিয়াছিল। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটাইয়া জনসাধারণ কর্তৃক যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতাসীন করার পর কাহারা কেন্দ্রের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন সৃষ্টির জন্য ৯২-ক ধারা আর ৯৩-ধারার শাসন প্রবর্তনে সাহায্য-সহযোগিতা করিয়াছিল দেশবাসী এত তাড়াতাড়ি তাহা ভুলিয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে দেশবাসী ইহাও জানে যে, কোন রাজনৈতিক দল সর্বদা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের নায়কদের গণবিরোধী কাজকর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। ১৯৫৮ সালের পর মোহাম্মদ নূরুল্লাহদের আজিকার অনেক মুরুব্বীরা যখন নাকে সরিষার তৈল ঢালিয়া ইচ্ছা-সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন এবং যখন স্বৈরশাহী পূর্ব পাকিস্তানের অসংখ্য-অগণিত মানুষকে নিগৃহীত করিতেছিল, যখন বৈষম্য-বঞ্চনা নীতির যাঁতাকলে পড়িয়া পূর্ব পাকিস্তানের উচ্ছন্নে যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, তখন কোন দলের নেতা ও কর্মীরা আরামকে হারাম করিয়া দিবানিশি সংগ্রাম করিয়াছেন, দেশবাসীর তাহা অজানা নয়। স্বৈরশাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে গিয়া আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের কী আদিম হিংস্র-দমননীতির শিকারে পরিণত হইতে হইয়াছে, কেমন করিয়া শেখ মুজিবকে হয়রানি ও নির্যাতন করা হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তাঁহাকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিদায় দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং কেন আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীরা সেদিন হাসিমুখে নির্যাতন বরণ করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছিলেন দেশবাসী তাহা এত সহজে ভুলিয়া বসিয়াছে বলিয়া পি-ডি-পি ওয়ালারা কেমন করিয়া ভাবিতে পারিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য।

মোহাম্মদ নূরুল্লাহর উর্বর মস্তিষ্ক "সন্ত্রাস ও নয়া ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ" আবিষ্কার করিয়া "২২- পরিবারের একমাত্র এজেন্ট" এবং "আঞ্চলিকতার প্রতারণামূলক শ্লোগান" হইতে সতর্ক থাকার আহবান জানাইয়াছে। মোহাম্মদ নূরুল্লাহ-দের এই আরণ্যিক হিংস্রতা লইয়া আওয়ামী লীগের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ার কারণ দুর্বোধ্য নয়। মোহাম্মদ নূরুল্লাহরা কাহাদের 'এজেন্ট' সেই প্রসঙ্গ আপাততঃ বাদ দিয়া সবিনয়ে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, 'আঞ্চলিকতার' অপবাদ আওয়ামী লীগ কেন- পূর্ব পাকিস্তানের এমন কোন জীবিত বা মৃত জনপ্রিয় নেতা নাই যাঁহাদের উপর একাধিকবার বর্ষিত হয় নাই। যখনই যে বা যাঁহারা মূলধন গঠন, সরকারী উন্নয়ন ব্যয়, বৈদেশিক সাহায্য বন্টন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সরকার বন্টিত সুযোগ-সুবিধা তথা জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে যে নির্মমভাবে বঞ্চিত করা হইয়াছে উহার প্রতিকার দাবী করিয়াছেন কিংবা যখনই পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হইয়াছে, তখনই স্বৈরশাহী তাঁহাদের পদলেহী স্তাবক গোষ্ঠী, প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রকারী এবং কায়েমী স্বার্থবাদীরা আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতার অপবাদ দিয়াছেন। তখনই তাহাদের উর্বর মস্তিষ্ক হইতে পূর্ব পাকিস্তানে 'বিদেশী এজেন্ট' এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজকর্মের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা হইয়াছে। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের ভাগ্যে আঞ্চলিকতার অপবাদ জুটিয়াছে, শহীদ সোহরাওয়ার্দীও বাদ যান নাই। বস্তুতঃ স্বৈরতন্ত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থক এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রীরা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে এমন কেহ নাই, যাহাদের ভাগ্যে না উপরোক্ত অপবাদ জুটিয়াছে। সুতরাং পি-ডি-পি ওয়ালারা 'আঞ্চলিকতার' অভিযোগ করিবেন,

www.pathagar.com

তাহাদের মুরুব্বীরা পশ্চিম পাকিস্তানে হাটে-মাঠে-ঘাটে পূর্ব পাকিস্তান বিরোধী অপপ্রচার করিয়া বেড়াইবে, ইহা আর তেমন বিচিত্র কি?

এই চেনা-জানা মুখওয়ালারা জানেন দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মসূচীভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করিলে এতদিন দেশটাকে যাহারা লুটতরাজ করিয়া উদরপূর্তি করিয়াছে, তাহাদের লুটতরাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। তাই তাহারা মরিয়া হইয়া লাগিয়াছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। উদ্দেশ্য, আওয়ামী লীগকে প্রতিহত করিয়া "আমরা আর মামারা" অতীতের ন্যায় প্রাণ ভরিয়া ঘি খাওয়ার সদর রাস্তা তৈরী করা। অন্যথায় কাহারও পক্ষে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে হেন উদ্ভট অভিযোগ করা সম্ভব নয়। কেননা সকলেই জানেন, সুদীর্ঘকালের অবসানে গত মাসের পহেলা তারিখ হইতে দেশে অবাধ রাজনীতি চর্চার সুযোগ আসার পরক্ষণ হইতে আওয়ামী লীগের প্রতিটি নেতা ও কর্মী শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুকূল পরিবেশ রক্ষার জন্য অহোরাত্রি কাজ করিয়া যাইতেছেন। আওয়ামী লীগ নেতারা নির্বাচন বিরোধীদের উস্কানিতে পা না দেওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আকুল আবেদন জানাইতেছেন। পল্টনের জনসভায় জামাতে ইসলামী এবং বিভিন্ন স্থানে পি-ডি-পি-ওয়ালারা আদিম হিংস্রতা লইয়া আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ও চরম উস্কানিমূলক উক্তি করিলেও আজ পর্যন্ত কোন আওয়ামী লীগ নেতা বা কর্মী অনুরূপ মানসিকতা দেখান নাই। এমনকি আক্রমণের জবাবে যে ভাষা প্রয়োগ করা স্বাভাবিক, সেই স্বাভাবিক কার্য হইতেও তাঁহারা বিরত থাকিতেছেন। ইহার কারণ, গণতন্ত্র এবং নিয়মতান্ত্রিকতায় আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাসের বশেই তাঁহারা আক্রমণাত্মক উক্তি বর্জন করিয়া চলিতেছেন। আজ পর্যন্ত পি-ডি-পি ওয়ালাদের মত "উস্কানিমূলক ও ফ্যাসিবাদী" সমালোচনার প্রশ্রয় আওয়ামী লীগ দেয় নাই-- ভবিষ্যতেও দিবে না, দিতে পারে না।

দেশের সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ উহার প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্য-বঞ্চনা নীতির অবসানের জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। বৈষম্য বঞ্চনা পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করিয়া পরিণামে সংহতির পক্ষেই অহিতকর হইয়া দাঁড়ায়, তাই আওয়ামী লীগ পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীদার। কেননা, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদত্ত হইলে দেশের প্রতিটি অঞ্চল সমভাবে উন্নত হওয়ার সুযোগ পাইবে, বৈষম্য-বঞ্চনার অবসান ঘটিবে। উহাতে সাধারণ মানুষকেও অনাহারে-অর্ধাহারে কালাতিপাত করিতে হইবে না। পক্ষান্তরে মাত্র কয়েক দিন পূর্বেও আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার দলের বৃহৎ ব্যাঙ্ক-বীমা জাতীয়করণ, পাটচাষীদের ন্যায্য মূল্যদান, ইক্ষু-তামাকচাষীর উৎপাদিত শস্যের ন্যায্য মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান এবং পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকের জমির খাজানা মওকুফ করার নীতি ঘোষণা করিয়াছেন। আওয়ামী লীগ মেনিফেষ্টোতেও এই সবের সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। বস্তুতঃ আওয়ামী লীগ সম্পদের সুষম বন্টনের নীতিতে বিশ্বাসী। ইহা তাহাদের মেনিফেষ্টোরও অঙ্গীভূত। এতসবের পরও পি-ডি-পিওয়ালাদের উর্বর মস্তিষ্ক আওয়ামী লীগকে বাইশ পরিবারের একমাত্র এজেন্ট হিসাবে আবিষ্কার করিয়াছে। ইহার পর "বল মা, মোরা দাঁড়াই কোথা" বলা ছাড়া আর কিছু ভাবিয়া পাই না। আওয়ামী লীগ

www.pathagar.com

যদি উহাই হইবে, তাহা হইলে মোহাম্মদ নূরুল্লাহদের যেসব মুরব্বীরা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা "সর্বাধিক পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনের" বোগাস কথার আড়ালে দেশের একাঞ্চলে সম্পদ পুঞ্জীভূত রাখার চেষ্টা করিতেছে, যাহারা পূর্ব পাকিস্তান বিরোধী অপপ্রচারণায় মত্ত, যাহারা "প্রাসাদ ষড়যন্ত্র" করিয়া অনেক অনর্থ অতীতে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারা কাহাদের স্বার্থের ভারবাহী? পি-ডি-পি ওয়ালাদের উর্বর মস্তিষ্কে না ঢুকিলেও "সর্বোচ্চ" কথাটা যে অনির্দিষ্ট এবং ইহাতে যে বিস্তর ফাঁক রহিয়াছে, জনসাধারণ তাহা বুঝে।

মোহাম্মদ নুরুল্লাহ্ আওয়ামী লীগ আয়োজিত পল্টনের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ জনসভাকে বিরাট "জুয়াখেলা" রূপে চিত্রিত করিয়া উক্ত জনসভায় "আড়াই লক্ষ টাকা" ব্যয়ের এক সাংঘাতিক চাঞ্চল্যকর তথ্যোদঘাটন করিয়াছেন। আমরা জানি, কেবলমাত্র কেরানী নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ-প্রাপ্তির মাধ্যমেই হেন তথ্য লাভ করা সম্ভব। যাহা হউক, উপসংহারে তিনি আরও বলিয়াছেন, "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা" "পশ্চিম পাকিস্তান হইতে এই এলাকাকে পৃথক করার জন্য তাহাদের অর্থ জোগাইতেছে।" টাকাটা মোহাম্মদ নূরুল্লাহদের কাহারও সূত্রে প্রদত্ত হইয়াছে কিনা, তাহা তিনি বলেন নাই। তবে সম্ভবতঃ তিনি "সাম্রাজ্যবাদী খেলার" আবিষ্কার কাহিনী প্রকাশ করিয়া জব্বর বড় নেতা বনিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই আবিষ্কার কাহিনীটা একই সময়ে অন্য আর এক কণ্ঠেও উচ্চারিত হইয়াছে। তিনি খুলনা নিবাসী জনাব আবদুস্ সবুর খান। জনাব সবুর খান আজীবন 'উল্টা' ঠেলিয়াছেন—বার্ধক্যেও তিনি যে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহার সাম্প্রতিক ক্রিয়াকর্ম হইতেই তাহা সুস্পষ্ট। শোনা যায় বিগত স্বৈরশাহীর সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে নাকি সমাজতন্ত্রী ত্রিরত্নের অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল। সেই ত্রিরত্ন নাকি খুলনার জনাব সবুর খান, 'উমাইপুরের' মোনেম খান এবং সিন্ধুর সর্ববৃহৎ ভূস্বামী জনাব ভুট্টো। সেই ত্রিরত্নের পাল্লায় পড়িয়া বেচারা সমাজতন্ত্রের কি দশা ঘটিয়াছিল, সেই গবেষণায় কাজ নাই, তবে হেন সমাজতন্ত্র আর যাহা হউক, দেশবাসীর কাম্য হইতে পারে না। সেই 'অপূর্ব সমাজতন্ত্রীদের' কথা আর চিন্তা-ভাবনার সহিত পি-ডি-পি ওয়ালাদের ধ্যান-ধারণা মিলিয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা বিস্ময় বোধ করিতেছি। তবে কি Great man thinks alike কথাটাই এইক্ষেত্রে প্রযোজ্য? তবে কি মোনেম খান আর সবুর খান যে স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন, মোহাম্মদ নূরুল্লাহদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যও তাহাই?

উদ্দেশ্য-বিধেয় সম্পর্কে জনসাধারণকে আরও বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে হইবে, এমন মনে হয় না। লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে 'জুয়াড়ী' ভাবিতে যাহাদের চিত্ত-বৈকল্য ঘটে না, জনসাধারণকে জুয়া খেলার দর্শকরূপে আখ্যায়িত করিতে যাহাদের রসনা আড়ষ্ট হয় না, তাহারাই সকল অকাজের কাজী। তাহাদের অভিধানে অসম্ভব কিছু নাই। সকলেই জানেন জুয়ার আড্ডায় সৎ লোকের সমাগম হয় না। পল্টনের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ জনসভায় সমবেত লক্ষ লক্ষ মানুষ কি তবে 'জুয়াড়ী' বা 'জুয়ামোদী'? আশ্চর্য পি-ডি-পি ওয়ালাদের মানসিকতা। পরমাশ্চর্য ইহাদের ধৃষ্টতা! [জাতীয় আর্কাইভের সৌজন্যে]

www.pathagar.com

পিডিপি'র জনসভায় আওয়ামী তান্ডব (দৈনিক পাকিস্তান, ১৯৭০)

www.pathagar.com

পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট

পিডিপি'র জনসভায় গোলযোগঃ কয়েকজন আহত

(দৈনিক পাকিস্তান, ২রা ফেব্রুয়ারী-১৯৭০)

[আওয়ামী লীগ এদেশে গণতন্ত্রের নামে প্রথম অন্যের জনসভা ভাঙ্গার সংস্কৃতি চালু করে। এরা আরমানিটোলা, পল্টন মাঠ ও রূপমহল হলে শেরে বাংলা, ভাসানী, ন্যাপ, জামাত প্রভৃতি দলের জনসভা ও সম্মেলনে হামলা করেছে। সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দিয়েছে। তেমনি পিডিপি'র ১৯৭০ সালের জনসভায় হামলার কিছু বিবরণ তৎকালীন জাতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জাতীয় আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত কিছু তথ্য এখানে উদ্ধৃত হলো] - সম্পাদক ।

রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শুরু হওয়ার ঠিক একমাস পর পিডিপি গতকাল পয়লা ফেব্রুয়ারী পল্টন ময়দানে তাদের দলীয় বক্তব্য পেশ করতে এসে একশ্রেণীর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর হট্টগোলে বারম্বার বাধাপ্রাপ্ত হন।

সভা শুরুর মুহূর্ত থেকেই কোনরূপ প্ররোচণা ব্যতিরেকেই ডজন দেড়েক লোককে প্রথমে নানাধরনের শ্লোগান দিতে ও নৃত্য করতে দেখা যায়। ফলে, গোড়া থেকেই শ্রোতারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মাঠে ছোটাছুটি করতে থাকেন। একবার সভার উদ্যোক্তারা শান্ত হয়ে জমায়েত হওয়ার অনুরোধ জানালে তারা কিছুটা মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসেন, আবার শ্লোগানধারীদের হট্টগোলে পিছু হটে যান। এভাবে পর্যায়ে পর্যায়ে হট্টগোলের মধ্য দিয়ে পিডিপির জনসভা চলতে থাকে এবং সমাপ্ত হয়।

পিডিপির কর্মীরা এইদিন চরম সহনশীলতা ও ধৈর্যের প্রমাণ দেন। এদিনের জনসভায় জনাব নূরুল আমীন শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হননি।

হট্টগোলে পিডিপি নেতা মওলবী ফরিদ আহমদ,জনাব ফজলুল হক, জনাব এ এস এম সোলায়মান সহ আরো অনেকে আহত হন।

বেলা ৩টা ২৫ মিনিটে সভার কাজ শুরু হয়। সভার সভাপতি হিসেবে জনাব আবদুস সালাম খানের নাম প্রস্তাব ও সমর্থন করার পর সভার কাজ শুরু হয়। প্রথমে পবিত্র কোরান তেলওয়াত হয়। এ সময় বেশ কিছু লোককে মাঠ ছেড়ে চলে যেতে দেখা যায়। খানিক পর স্টেডিয়ামের উপর লোকজনকে জড়ো হতে দেখা যায়। বোধ হয়, ময়দানের লোকজনই নিরাপদ দূরত্বের জন্যে স্টেডিয়ামের উপরে স্থান নেয়।

জনাব আবদুস সালাম খান বক্তৃতার শুরুতে গণআন্দোলনের শহীদানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তার বক্তৃতা শুরু হতেই মাঠের এককোণ থেকে খানিকটা হল্লা ওঠে এবং দুও ঐ ঐ ঐ ইত্যাদি ধ্বনি ওঠে। জনাব সালাম খান এসব কর্ণপাত

www.pathagar.com

না করে বক্তৃতা দিতে থাকেন। তিনি বলেন, দেখা গেছে গত গণআন্দোলনের স্বর্ণফসল গণতন্ত্র আমাদের ভুলেই আমাদের দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে গেছে। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জাগ্রত জনতা কখনো ভুল করে না এ বিশ্বাস তার আছে। ১৯৪৬ সালে, ১৯৬৫ সালে, ১৯৬৮-৬৯ সালে তারা ভুল করেনি। আমার ধারণা পূর্ববাংলার মুসলমান এবারো ভুল করবে না। দীর্ঘ ১০-১২ বছর অন্ধকার যুগের পর আবার আমরা গণতন্ত্র ফিরে পেতে যাচ্ছি; ৫ই অক্টোবর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আমার প্রার্থনা– শহীদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। আমার অনুরোধ– ভেবে দেখুন, সত্যি কি আমরা গণতন্ত্র চাই। যদি চাই তবে যদি আমাদের পরমত সহিষ্ণুতা না থাকে তবে আমরা ঈপ্সিত লক্ষ্যে কি করে যাবো?

গোলযোগের সূত্রপাত

এ পর্যায়ে বেলা প্রায় ৩-৪০ মিনিটের সময় মঞ্চ থেকে প্রায় ৩০ গজ দূরে লাউড স্পীকারের খুঁটির সাথে শ্রোতাদের মধ্য থেকে একটি ক্যালেন্ডার ঝুলিয়ে দেয়া হয়। ক্যালেন্ডারে মরহুম মানিক মিয়ার পাশে উপবিষ্ট শেখ মুজিবের একটি বৃহৎ ছবি এবং মরহুম সোহরাওয়ার্দীর ছবিও ছিল। শ্রোতাদের একটি অংশকে সেখানে নৃত্য করতে ও ৬ দফা জিন্দাবাদ শ্লোগান দিতে দেখা যায়।

জনাব সালাম খান এসব উপেক্ষা করে বক্তৃতা দিতে থাকেন। তিনি বলেন, সভায় যদি মুষ্টিমেয় কেউ ইচ্ছে করেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চান তা সভার উদ্যোক্তাদের কলংক হবে না।

তার বক্তৃতা চলাকালে সেই লোকজনকে শ্লোগান দিয়ে মঞ্চের আরো খানিকটা কাছে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। এসময় জনাব সালাম খান বক্তৃতা অসমাপ্ত রেখে বসে পড়েন। তখন জোর শ্লোগান চলছে। **পিডিপির জনাব নূরউল্লাহ এসময় মাইক নিয়ে বক্তৃতা করতে চেষ্টা করেন।**

শ্লোগানকারীরা এসময় মঞ্চের আরো কাছে এগিয়ে আসে। এবার জনাব সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া মাইক হাতে নেন । শ্লোগানকারীরা তখন মঞ্চের মাত্র হাত দুয়েক দূরে। নান্না মিয়া তখন বলছিলেন, ভাইসব আমরা হিংসায় বিশ্বাস করি না। যদি মনে করবেন সভা পন্ড করবেন তবে ভুল করবেন। দয়া করে আমাদের কথাও বলতে দিন .....।

এসময় কোন কোন নেতার কল্লা চাই বলে শ্লোগান উঠছিল। জনাব নান্না মিয়া বলেন, কল্লা নিতে চান নেবেন, কিন্তু কথা শুনুন। গণতন্ত্রের এটা নীতি নয়। মঞ্চের পাশে সাংবাদিকদের দিকে ফিরে বলেন, চেয়ে দেখুন। উদ্যোক্তাদের কেউ বাধা দিচ্ছে না। তিনি বলেন, যাদের ছবি হাতে নিয়ে আপনারা শ্লোগান দিচ্ছেন তাদের ছবি অবমাননা করার কোন অধিকার আপনাদের নেই। মরহুম মানিক মিয়া আমাদের শ্রদ্ধেয়, শেখ মুজিব আমার বন্ধু। জনাব নান্না মিয়া প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী আবার ব্যাখ্যা করতে শুরু করলে শ্লোগানদানকারীরা মঞ্চে একটি ক্যালেন্ডার ছুঁড়ে মারেন। জনাব নান্না মিয়া বলেন, এই ছবি আমরা মাথা পেতে নিচ্ছি। কিন্তু আমার কথা শুনুন। যতই শ্লোগান দিন যতই কিছু ছুঁড়ুন আমি বক্তৃতা দেবোই। এ আমার

www.pathagar.com

অধিকার। প্রত্যেকের বক্তব্য শুনতে হবে। আমাকে বলতে দিন। কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রের জন্যে লিয়াকত থেকে পরবর্তীকালে গণতন্ত্র হত্যা হয়েছে।

মঞ্চে ওঠার চেষ্টা

এ পর্যায়ে ৩.৫০ মিনিটে বিক্ষোভ ও শ্লোগান দানকারীরা মঞ্চের পাদদেশ ধরে মঞ্চে ওঠার চেষ্টা করতে থাকে। মঞ্চে ঢিল পড়ে। জনাব নান্না মিয়া তখনো বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলছিলেন,ভাইসব! দেশে বিশৃঙ্খলাকারী থাকলে গণতন্ত্র আসবে না। আমরা তো কারো বিরুদ্ধে কিছু বলছি না। বিনীত নিবেদন আমাদের বক্তব্যও শুনুন।

এ পর্যায়ে ৩.৫৫ মিনিটে শ্লোগানধারীরা মঞ্চ দখল করে নেয়। কেউ মাইক্রোফোন ও স্ট্যান্ড নিয়ে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে পড়ে। কেউ মঞ্চের পশ্চাদপটে পোষ্টারগুলো ছিঁড়তে থাকে। সারা মাঠে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়। এ সময় পিডিপির কিছু নেতাকে পুলিশ পুলিশ বলে ষ্টেডিয়ামের গেটের দিকে ছুটতে দেখা যায়। ৩.৫৭ মিনিটে ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী মাঠে ছুটে আসেন এবং মঞ্চের সম্মুখভাগ থেকে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেন। এ সময় বহুলোককে ছুটে দূরে সরে যেতে দেখা যায়। কিন্তু মাঠ ছেড়ে তারা যাননি। উদ্যোক্তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলেই হোক কিম্বা তামাশা দেখা কিম্বা বক্তাদের বক্তব্য শ্রবণের উদ্দেশ্যেই হোক তারা ময়দানেই থেকে যান। ইতিমধ্যে পুস্তক বাঁধাই সমিতির এক নেতার নেতৃত্বে ক্ষুব্ধ শোভাযাত্রাকারীর একটি দল সভাস্থলে আসে। একজন মাইক্রোফোনও উদ্যোক্তাদের ফিরিয়ে দেয়। মিনিট চারেক পর ৪টা ২ মিনিটে ভাংগা সভা পুনরায় শুরু হয়। বক্তৃতা শোনার জন্যে উদ্যোক্তা লোকজনকে স্থির হয়ে বসতে অনুরোধ করতে থাকেন।

পিডিপির জনাব নুরউল্লাহ ও জনাব মুনসুর আলী এসময় প্রায় ৮ মিনিট বক্তৃতা দেন। কিন্তু গোলমাল থামেনি। বক্তৃতা শুরু হতেই আবার শ্লোগান, হল্লা শোনা যায়, ঢিল ও জুতা প্যান্ডেলের দিকে শূন্যে ধাবিত হয়ে আসতে দেখা যায়। এ সময় শ্রোতাদের একাংশের মধ্যে শ্লোগানধারীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হতে থাকে।

আমার বক্তৃতা শুনবেন?

বেলা ৪টা ১০ মিনিটে মওলবী ফরিদ আহমদ মাইকে আসেন। তিনি দাঁড়াতেই সভার পরিবেশ সম্পূর্ণ উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে পড়ে। দাঁড়িয়েই মওলবী ফরিদ আহমদ শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি আমার বক্তৃতা শুনতে চান? যারা চান হাত তুলুন। অমনি গোটা শ্রোতামন্ডলী হাত তুলে বিরূপ ধ্বনি ও বক্তৃতা শুনবে না বলে হাত নাড়তে থাকে। মওলবী ফরিদ বক্তৃতা করতে বার বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।

এদিকে সমানে শ্লোগান চলছে। পুলিশ বিক্ষোভকারী ও সভামঞ্চের সম্মুখের লোকদের মধ্যে একপাশে বেষ্টনী দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাঠের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ বাহিনী প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। বহুলোক স্টেডিয়ামের উপরে। মাঠের মধ্য থেকে মঞ্চের দিকে ঢিল ও জুতা ছোঁড়া হচ্ছে।

মওলবী ফরিদ আহমদ বল্লেন, আপনারা এদেশে আরেকটি মার্শাল ল চান? আজ যদি পল্টনে জনসভা না হয় তবে গণতন্ত্রের আন্দোলনকে ছুরিকাঘাত করা

www.pathagar.com

হবে। ঢিল মেরে আমাদের ঠেকানো যাবে না। পুলিশ বাহিনীকে জিজ্ঞেস করছি– মার্শাল ল-এর ৬০ নম্বর রেগুলেশন কি মান্য করা হচ্ছে?

এ সময় একের পর এক ঢিল আসছিল। মওলবী ফরিদ আহমদ বলছিলেন– মারো। আরো মারো! আসো আগাইয়া আসো! সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন, দেখুন! কে ঢিল মারে। এ সময় পুলিশ দু'তিনজন লোককে ধরে ফেলে।

ফরিদ আহমদ সাহেবের কাছ থেকে মাইক নিয়ে এ সময় মওলানা আবদুল মতিন বক্তৃতা শুরু করেন। তাকে বলতে শোনা যায়, ন্যাশনাল প্রিন্টিং কর্পোরেশন চাই না। পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক সমিতি জিন্দাবাদ। ফরিদ আহমদ আবার মাইক নেন।

তখনো শ্লোগান চলছে--জাগো জাগো বাংগালী জাগো, তোমার দেশ আমার দেশ বাংলা দেশ বাংলা দেশ, ছয়-দফা এগার দফা মানতে হবে মানতে হবে, তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব, পিন্ডি না বাংলা বাংলা বাংলা, দালালী চলবে না ইত্যাদি।

এ পর্যায়ে নান্না মিয়া বক্তৃতা দিতে ওঠেন। তিনি বক্তৃতা দিতে পারলেন না। আবার মওলবী ফরিদ আহমদ উঠলেন। তাকেও সাথে সাথে বসে পড়তে হলো।

জনাব মাহমুদ আলী বলেন, দেশের প্রত্যেক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে একাত্মবোধ চাই, বিরাট বিভেদের মধ্যে চাই মহামিলন। ন্যায্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায় করেই আমরা একত্রিত হতে চাই। বাংলা, পাঞ্জাব, সরহদ ইত্যাদি অঞ্চলের লোককে রাজনৈতিক দলভুক্তভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তিনি আহবান জানান।

জনাব মাহমুদ আলীর বক্তৃতা চলাকালেও সেই আগের মতো শ্লোগান চলতে থাকে, ঢিল পড়তে থাকে। দূরে সরে যাওয়া লোকজন আবার মঞ্চের নিকটতর হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। তবে মাহমুদ আলী একনাগাড়েই বক্তৃতা শেষ করতে পারেন।

জনাব আবদুস সালাম খান ৪-৫৫ মিনিটে আবার বক্তৃতা দিতে উঠেন। তিনি দাঁড়াতেই হৈ হৈ শুরু হয়।

তিনি বলেন, ৬ দফা পছন্দ করি কি না, কেন ত্যাগ করলাম শুনবেন তো, আমার কথা না শুনলে জওয়াব দেবেন কি করে?

আবার হট্টগোল তীব্র হয়। কিছু লোকজন বলতে থাকেন 'চাই না, চাই না'। এদিকে জনাব মোহন মিয়া বক্তাকে পয়েন্ট জুগিয়ে দিচ্ছেন।

সালাম খান

জনাব আবদুস সালাম খান বলেন, সাধারণ নির্বাচনের সাথে জড়িত রয়েছে জনগণের সার্বভৌমত্ব। এর বিপক্ষে একদল প্রকাশ্যে বলছে--নির্বাচন চাই না বিপ্লব বিপ্লব, আরেক দল নির্বুদ্ধিতাবশতঃ অথবা অন্য কারণে পরোক্ষভাবে নির্বাচন বানচাল করতে চান। মওলানা ভাসানী সাহেবের দল এসে যদি এই সভা পন্ড করে

www.pathagar.com

দেয়, মঞ্চ পুড়িয়ে দেয়, তবে না হয় বোঝা যেত কথায় কাজে এক। কিন্তু মুখে এক কথা বলে পরোক্ষে নির্বাচন বানচাল করতে চায় তাদের কথা ভেবে বিস্ময় হয়, লজ্জা হয়।

এ সময় শ্লোগান তীব্রতর হয়ে ওঠে। একটি শ্লোগানের জবাবে জনাব আবদুস সালাম বলেন, গোলটেবিল বৈঠকের নেপথ্য কাহিনী বলতে হবে ভাবিনি, বলার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আজ বলবো। আমরা সব কিছু এমন কি স্বায়ত্তশাসন পর্যন্ত পেতে যাচ্ছিলাম তখন আমার বন্ধু, ইউসুফ হারুন প্রমুখ আইয়ুবের সাথে গোপন বৈঠক করলেন। কেউ আবার ওয়াক আউট করলেন। গোলটেবিল বৈঠক ভেঙ্গে দেয়া হল।

একটি শ্লোগানের জবাবে জনাব আবদুস সালাম খান বলেন, মীরজাফর কারা তা জনগণ জানে। যারা আমেরিকা ও ভারতের দালালী করে তারা মীরজাফর নয়, তবে কারা জনগণের বিশ্বাসঘাতক? ইতিহাসই তার প্রমাণ দেবে।

জনাব আবদুস সালাম খান বলেন, শিল্পপতিদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খেয়ে কারা সভা করে, অন্যের সভায় গোলযোগ করে তা আমরা জানি, জনগণও জানতে পারবে।

এ পর্যায়ে ৫টা ৫ মিনিটে হট্টগোল আবার তীব্র হয়। শ্লোগান উঠতে থাকে। পুলিশ কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। এ সময় পর পর জনাব শামসুর রহমান, জনাব দলিলুর রহমান, জনাব শফিকুর রহমান আর নূরউল্লাহ বক্তৃতা দেন। ঘোষণা করেন, গণতন্ত্রের সংগ্রাম চলবেই। এদেশে আর কোথাও এ ধরনের ফ্যাসীবাদী কার্যক্রম হলে পরিণতি খারাপ হবে বলে হুঁশিয়ারী জানান। জনাব মোহন মিয়া বক্তাদের বক্তৃতার পয়েন্ট জুগিয়ে দিতে দেখা যায়।

সভায় গোলযোগের জন্য জনাব নান্না মিয়া ও মওলবী ফরিদ আহমদ বসে পড়লে এবার মাইক হাতে নেন জনাব রফিকুল হোসেন। তিনি বলেন, সন্তানদের আমার কথা শুনতে হবে। চিৎকার ওঠে--বইয়া পড়েন। ঢিল আসছে। জনাব রফিকুল হোসেন বলে চলছেন, সন্তানদের কাছে কি গুরুজনের বক্তব্য পেশ করা যাবে না। আপনাদের কথা শুনলাম। এখন আমাদের কথা শোনেন। বলতে দেবেন না এটা কেমন কথা। তিনি বলেন, পল্টনের অমর্যাদার ফলে গত ১২ বছর পল্টনের লাঠি আমাদের পিঠে পড়েছে। ফ্যাসিজম বাদ দিন। হিটলারের দুষ্টবুদ্ধি ও পাগলামীর কাছে জার্মানী হেয় হয়েছে।

এ সময় বিদ্যমান হল্লা আরো তীব্ররূপ ধারণ করে। শ্রোতাদের কেউ কেউ দড়ি তুলে বলে অমুকের ফাঁসী চাই।

জনাব রফিকুল হোসেন বলতে থাকেন, গেষ্টাপো পার্টি যতই বিশৃঙ্খলা করুক না কেন আমরা ধৈর্য ধরবো। আপনারা বাংগালী জাগো বাংগালী জাগো বলছেন কিন্তু বাংগালীর চরিত্র কোথায় দেখাচ্ছেন? বাংগালীর চরিত্রের সেই শ্রদ্ধাবোধ কোথায়? আমরা মুসলিম আমরা বাংগালী। কোথায় সেই গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ? আমরা

www.pathagar.com

বাংগালী হতে রাজী আছি পাশবিক হতে রাজী নই।

এসময় বেলা চারটা আটাশ মিনিটে নিক্ষিপ্ত ঢিলে মঞ্চের সামনে ও পাশে পরপর দুজন লোক আহত হয়। মওলবী ফরিদ আহমদ মাইক নিয়ে বলতে থাকেন,পুলিশ দাঁড়িয়ে কি করছে? এসময় একটি ঢিল তাঁর গায়ে পড়ে। মঞ্চেও হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। চারটা তিরিশ মিনিটে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হতে লোকজন মাঠ ছেড়ে স্টেডিয়ামের দিকে ছুটে যায়। মঞ্চ থেকে শ্লোগান ওঠে, ফরিদ আহমদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না।

মিনিট দু'য়েকের মধ্যেই বৃষ্টি থেমে যায়। চারটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে জনাব নূরউল্লাহ ও চারটা চল্লিশ মিনিটে জনাব রফিকুল হোসেন বক্তৃতা শুরু করেন। এসময় খানিকক্ষণ মাইক বিকল থাকে।

জনাব রফিকুল হোসেন তখন বলছিলেন, ছয় দফা মানি কিনা জিজ্ঞেস করছেন? কার ব্যাখ্যা মানবো? মরহুম মানিক মিয়ার ব্যাখ্যা অথবা যে ব্যাখ্যা মোজাফফর আহমদ দিচ্ছেন তা? আমার কথা বলবো – যে ব্যাখ্যায় কলকাতা ও ওয়াশিংটন খুশী হবে তা গ্রহণ করতে পারি না।

মাঠে হল্লা চলছে। বেলা চারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে জনাব মাহমুদ আলী বক্তৃতা দিতে ওঠেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্র আদায়ের জন্য আমরা নতুন পরিবেশে সংগ্রাম শুরু করেছি। নির্বাচনকে যারা বানচাল করতে চায়, যারা ফ্যাসিজম প্রয়োগ করছে তাদেরকে রুখে দাঁড়ান।

জনাব মাহমুদ আলী বলেন যে, আইয়ুব খান বেয়নেট নিয়ে কণ্ঠকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করছেন, আরেক দল ফ্যাসিবাদের নগ্ন আশ্রয় নিচ্ছে– স্তব্ধ করার এই দুই ধরনের প্রয়াসের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

তিনি বলেন, আমাদের অপকর্মের জন্য যদি নির্বাচন বন্ধ হয়ে যায় সামরিক শাসন আরো দশ-বারো বছরের জন্যে চেপে বসে তার জবাব কে দেবে? একথা স্মরণ রাখা দরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বেঁচে থাকতে পারে। **(জাতীয় আর্কাইভস এর সৌজন্যে)।**

ORGANISED DISTURBANCE AT PALTAN PDP'S CALL TO RESIST FASCISM

(THE PAKISTAN OBSERVER , FEBRUARY 2, 1970)

Despite repeated attempts by a organized group to create trouble, Pakistan Democratic Party held a public meeting at Paltan Maidan on Sunday.

The heckler chanted slogans like "Six-Point Zindabad" and "Jago Bangali jago" in order to interrupt the meeting .

They missiles at the dais injuring several persons including Mr. Farid Ahmed and Mr. Fazlul Huq of city PDP and at one stage they attacked the speakers at the dais and occupied it for some moment.

www.pathagar.com

The meeting which was presided over by Mr. Abdus Salam Khan President, East Pakistan PDP gave a clarion call to create public opinion against the fascist actions by certain group of people to thwart the freedom of speech and expression.

In a resolution the meeting condemned the hooliganism perpetrated on the meeting and said that it was the very spirit of democracy that every individual should enjoy unfettered freedom to express their views and opinion.

Maintaining that democracy was meaningless without ensuring the freedom of expression the meeting said that their movement for the restoration of democracy would continue. The speakers of meeting also called upon the people to make use of the ensuing election discreetly for the restoration of their democratic rights.

Among others the meeting was addressed by Mr. Mahmud Ali, Syed Azizul Huq. Mr. Rafiqul Hussain, Mr. Nurullah, Mr. Farid Ahmed, Mr. Shamsur Rahman, Mr. Shafiqur Rahman and Mr. Dalilur Rahman.

At the beginning when the name of the president of the meeting was proposed, a group of people consisting about 30 to 40 persons on the western side of the dais rushed towards the dais and took their seats near a microphone pole about 20 yards away from the dais.

Call for tolerance

Taking the microphone, Mr. Abdus Salam Khan, president of the meeting recalled the martyrs who laid their lives for the realisation of the democratic rights of the people and said that they remembered those heroes with gratitude.

He hoped that the people of East Pakistan would make the best use of the ensuing election with discreet and tolerance to establish democracy in the country. He said that the Muslims of Bengal had never committed any blunder on any vital issue. They gave a correct judgement in 1946 elections by casting votes in favour of Pakistan and in 1952 they resisted tooth and nail the attack on the Bengali language. He said that once again in 1954 they saved the country by ousting Muslim League and in 1962 by supporting Fatima Jinnah for the restoration of democracy.

At this stage, the same group which had occupied the ground near the dais raised a calender page bearing photographs of Sher-e-Bangla, Mr. Suhrawardy, Mr. Manik Mia and Sheikh Mujibur Rahman over their heads and sticked it on the microphone pole. They also raised slogans, Six-Point Zindabad. Sheikh Mujib Zindabad, Joy Bangla and

www.pathagar.com

Nurul Aminer Kolla Chai (behead Mr. Nurul Amin). They also hurled abuses to the speakers asking them to sit down.

The hecklers rushed towards the dais and reached near it. Another copy of the calendar page in folded shape was thrown at the dais.

Welfare society

By that time Syed Azizul Huq took over the microphone and said that it was really disgraceful that the group who were apparently the supporters of the leaders were disrespectful towards them. The hecklers did not appear to be in any mood to listen to any reason nor be pacified by any sense of humour.

Syed Azizul Huq said that 23 years of Pakistan was a history of exploitation and the people were determined to create a democratic welfare society and to make an end to this ignominous history.

Meanwhile, the hecklers continued to throw missiles aiming at those sitting on the dais. Amidst all these Syed Azizul Huq said that it was his fundamental right to speak to those who wanted to listen to him. But the hecklers climbed the dais and started raising slogans. They also snatched away the microphone and tried to run away with it when a contingent of steel helmeted police party rushed towards the dais and the hecklers fled away.

Immediately Mr. Md. Nurullah of Chittagong took the microphone and requested the audience who were standing to sit down. Enumerating the role of the leaders of PDP for the restoration of democracy in the country Mr. Nurullah said that let the Paltan meeting decide whether the country will have democracy or play in the hands of autocrats.

Stones pelted

Maulana Abdul Matin also spoke for a couple of minutes at this stage.

Though standing, the audience began swelling up. Soon after Mr. Farid Ahmed had come before the microphone to address the meeting the hecklers again started shouting slogans Sheikh Mujib Zindabad and pelted stones at him. A tiny boy who was sitting close to dais was hit in his head.

Mr. Rafiqul Hussain pushed Mr. Farid Ahmed and was trying to pacify the group by appealing to their good senses but to no avail.

He however said that the people could not allow to be cowed down by any Individual leadership. He pointed out to the danger when the destiny of the country was dictated by one individual. At this stage Mr. Farid Ahmed who was standing beside Mr. Rafiq was hit by a stone on his head.

www.pathagar.com

Continuing, Mr. Rafiqul Hussain said that the demand of autonomy was virtually the same of all political parties. But, he said, Six Point programme had even been opposed by late Manik Mia, editor of Ittefaque.

Amidst shouting and pelting of stones by the hecklers, Mr. Mahmud Ali began to address the audience. He said that it was the second public meeting they were holding at Paltan Maidan the first one being in1962 under the leadership of late Mr. H.S. Suhrawardy.

He said that they raised an unequivocal demand that no one man had the right to deny the democratic rights of the people. He said that the very meaning of democracy was the right to self expression unhindered. He said that the movement for this right would continue until the people enjoy unfettered freedom of expression of their viewpoints and ideas.

Pointing out the threat to democratic rights when expression was controlled by dictators, Mr. Mahmud Ali said that if the people could not know the different opinions, they would fail to come to a conclusion which was so vital for democracy in any country of the world.

Mr. Mahmud Ali said that it would be an unforgivable crime on our part, if by our sheer folly we fail to achieve democracy in the country. He said that Pakistan was created by democratic means and should only prosper under a democratic system.

Mr. Mahmud Ali added that only under a democratic system Pakistan would emerge an welfare state keeping alive the regional characteristics and economic interests. He called upon the people to make best use of the ensuing elections for creating an exploitation free democratic state in Pakistan.

Calling for sobriety and deep thinking, he said that it was because the people were divided that they could not resist the emergence of Martial Law in 1958.

Meanwhile, three to four persons were hit by stones pelted by the hecklers, among them were Mr. Fazlul Huq of PDP

In their speech Mr. Shamsur Rahman, Mr. Dalilur Rahman, Mr. Nurullah and Mr. Shafiqur Rahman said that if the tendency at Paltan spread throughout the province it would be most unfortunate.

Mr. Shamsur Rahman a former MPA, enumerated the PDP manifesto for the restoration of democracy in the country and creating a welfare state.

In his presidential speech, Mr. Abdus Salam Khan emphasising the

www.pathagar.com

importance of the ensuing election, said that the very sovereignty of the country was closely interlinked with the next elections and it was the duty of all citizens of the country to participate in it and realise a democratic society.

He said that two groups of people, one realising what they wanted and the other out of their ignorance, were directing their actions against holding the elections.

He said that the people, who were apparently for the elections were behaving in mysterious way and proving incongruous between their words and actions. He cautioned those elements not to indulge in such acts which may jeopardize the very foundation of democracy.

At this stage the hecklers (who by the time appeared to have lost much of their zest heckling at the sight of audience listening to the audience) raised slogans "They will not tolerate the agents of Maududi and Nasrullah" To this Mr. Khan said, we are not agents of anybody.

He said that it (the word Agent) did not sound nice in the lips of the supporters of those who were the agents of Indian Marwarees, American CIA and financed by the Haroons. He said that they were the Mir Zafars of Bengal. He added that during RTC these leaders conspired with Mr. Daulatana, Mr. Yusuf Haroon and former President Ayub to come to power surrendering the interest of East Pakistan.

The trouble did not end with the end of the meeting. The PDP leaders were chased on their way back. Immediately after Mr. Mahmud Ali, Mr. Yusuf Ali Choudhury (Mohon Mia) and Mr. A.K. Rafiqul Hussain alighted from the dais they were sorrounded by a section of hecklers who hurled abuses at them. A police contingent moved forward to their rescue and escorted them to DIT Avenue.

Paltan And Plassey

[THE PAKISTAN OBSERVER, FEBRUARY 3, 1970]

ANOTHER bloody battle for democracy has been fought on the Paltan Maidan. The surprising thing is that this battle is not being fought against the Martial Law regime which has allowed the people to prepare themselves for taking over power through a peaceful and democratic process, but it is being fought between political parties professing their loyalty to democracy.

The democratic process entitles every political group or party to

www.pathagar.com

the right of presenting its views to the people for their examination and acceptance or rejection at the polls. Democracy functions when an individual can express his opinion on men and matters without let or hindrance and when an individual can air his approval or disapproval of others opinion without having his head broken. It either guarantees the right of every individual to hear and be heard, or it does not exist.

Language

What happened on Sunday last at the Paltan Maidan was absolutely contrary to the democracy contrary to the democratic process of exchange of ideas. It was not a democratic confrontation of ideas, but a clash of cerebral exercise and brute physical force. The speakers had every right to address the audience and those who did not like the views of the former were free not to like them. But democracy did not give them the right to violently prevent the former from exercising their inalienable democratic right of assembly and expression. Yet that is exactly what some people did without even caring to hide their political identity. Through their full- throated and threatening shouts and slogans they eloquently betrayed their political affiliation. In a Paltan Meeting held earlier it was loudly and authoritatively declared that nothing said against ... point and .... point shall be tolerated. Was it the language of democracy? Or was it the voice of tyranny? Can democracy survive the repeated aggression against the democratic right of the political parties to address the people? Will the Paltan be the Plassey of democracy?

As things are, nobody will be able to do much as mention the word democracy without keeping first-aid material handy. Actually the situation is far more critical. One doubts if a person can assert his democratic rights at a public place without making previous reservation of hospital bed, if he can leave the place in one piece, that is.

Rigor Mortis

Each stone chip thrown at a political opponent makes a dent in the tender body of democracy, and each drop of blood oozing from his wound may lead to is rigor mortis. The moon rocks collected by the American moonmen were on display in Pakistan. We can send the chips and rocks used on us inflict mortal injuries on our democratic liberties for display in the democratic countries and we can .....have exhibits to show what some champions of democracy openly profess and how they really act.

www.pathagar.com

Vicious Modus Operandi

The violent way a meeting at Paltan Maidan of one party is sought to be broken up by another party by creating disturbance and even by resorting to violence has given rise to doubts in the minds of many about the motive behind it. It is believed by many that the party which succeeds in holding a large and expensive meeting at first undisturbed by others tries to prevent other parties from holding a sucessful meeting and presenting their viewpoints on the national issues to the public. The modus operandi is as vicious as it is effective. Some hired people are sent there to disrupt it by starting trouble on any pretext and if one wants, pretexts can easily be found. The peace-loving elements of the audience will naturally feel it unsafe to stay there in the face of intimidation and physical danger.

Brute Majority & Minority

This process was so blatantly and unconscionably adopted on last Sunday that it not only angered those who attended the large meeting not swelled by people brought from outside the city by providing free transport etcetera, but many of them have started worrying about the safety of peace loving citizens even in their homes. The whole thing looked like a pre-planned and organised offensive against the move to regain the long-lost rights of the people. Even if a particular party can claim the support of the majority, it cannot arrogate to itself the right to stifle the voice of the minority by force and if possible to obliterate it. Democracy does not mean vandalism and tyranny of the majority. In fact brute majority and brute minority are equally a menace to the establishment of people's authority.

Reign of Terror

But public meetings do not provide an unmistakable index of a party's strength. However big a Paltan meeting may be, the gathering represents no more than a small fraction of the city's population. The bulk of the population, the silent majority, that is, cannot but be concerned at the unhealthy developments and will certainly react to the calculated assaults on the political rights of the people. If a party can establish a reign of terror even before getting power, what will its leaders do if and when they come to occupy the seat of authority? A suitable answer to this question will have to be spelled out in unambiguous terms if we do not want to see another sunset of democracy.

www.pathagar.com

ইতিহাসের আলোকে
জনাব নূরউল্লাহ'র জবানবন্দী

[সম্প্রতি জনাব মুহাম্মদ নূরউল্লাহ'র সাথে আমার একান্ত স্মৃতিচারণমূলক আলাপচারিতায় তিনি দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। এর ফলে ৩১ বছর আগে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলো যে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিলো তা বেরিয়ে এসেছে। ইতিহাসের আলোকে নানা দৃষ্টান্ত ও উপমা টেনে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশিত গ্রন্থের সহায়তা নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগগুলো খন্ডনের মাধ্যমে জাতির কাছে দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। দীর্ঘ আলাপচারিতায় যে সব বক্তব্য বেরিয়ে এসেছে এর নির্যাসগুলো পাঠকদের জ্ঞাতার্থে নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। [সম্পাদক]

কথায় আছে 'হুজুগ' আর 'গুজব' এই দুইয়ে আনে গজব। এই হুজুগপ্রিয়তা পৃথিবীর সব দেশের জনগণের মাঝে কমবেশী বিদ্যমান রয়েছে। তবে আমাদের ক্ষেত্রে এ সর্বনাশা প্রবণতার আধিক্য একটু বেশী। এ প্রবণতার কারণে দেশে ঘটেছে নানা অনাসৃষ্টি। আজাদী হারিয়ে ইংরেজদের গোলামী করতে হয়েছে ১৯০ বছর। এই গোলামীর জিঞ্জির ভাঙতে দেখা দিয়েছিলো প্রচন্ড বিদ্রোহের দাবানল। এই বিদ্রোহের দাবানলে প্রাণ দিয়েছে অগণিত দেশপ্রেমিক। এই অগণিত দেশপ্রেমিকের রক্তের বিনিময়ে দু'দুবার আজাদীর পতাকা বদলিয়েও 'হুজুগ' ও 'গুজব' থেকে অব্যাহতি পায়নি জাতি। আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিকদের রক্তস্নাত আন্দোলনের ফসল তুলে দেয়া হয়েছে অন্যের ঘরে। বর্তমানে আমাদের দেশে এই হুজুগের মাত্রা উত্তরোত্তর মহামারী আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই সর্বনাশা প্রবণতার কারণে দেশের সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করছে অশান্তি, বিশৃংখলা, হত্যা, ডাকাতি, সংঘর্ষ, হানাহানি, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস। এছাড়া প্রতিটি জাতীয় ইস্যু আজ বিতর্কিত। যা বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে এর কোন নজীর নেই।

এই হুজুগের কারণে সত্য-মিথা, আসল-নকল, দেশপ্রেমিক-দেশদ্রোহী সব একাকার হয়ে গেছে। চোরও বলে চোর, সাধুও বলে চোর। কে যে আসল, কে যে নকল সাধারণ জনগণের বোঝা দুষ্কর।

আমরা কোন কিছুকে যুক্তি দিয়ে বুঝতে বা বুঝাতে চেষ্টা করি না। আবেগ দিয়ে তা বুঝতে বা বুঝাতে চেষ্টা করি। যুক্তির কষ্টি পাথরে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণ করতে চেষ্টা করি না। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে।

www.pathagar.com

কতিপয় বিশ্বাসঘাতক ছাড়া কোন মানুষ স্বাধীনতা বা দেশের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত হতে পারে না। জাতীয় সংকট উত্তরণের জন্য পদ্ধতিগত মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। পৃথিবীর বহু দেশেই তা আছে। কিন্তু আমাদের দেশে রয়েছে ভিন্ন ধরনের দুঃখজনক চিত্র। একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা করলেই পাইকারী হারে স্বাধীনতা বিরোধীসহ নানা অভিধায় অভিষিক্ত এবং নানা ভঙ্গিমায়, বিভিন্ন মিডিয়ায় দেশপ্রেমিক নেতা-নেত্রীদের চরিত্র হনন করা শুরু হয়। এদের গলাবাজি ও মিথ্যাচারের উচ্চকণ্ঠে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত নেতাদের অকাট্য যুক্তিনির্ভর বক্তব্য হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। তেমনি আজ থেকে ৩১ বছর আগে আমি এবং আমার দল যে সব বক্তব্য রেখেছে তা বিকৃত করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করেছে। এর ফলে "যুক্তিতে না পারলে শক্তিতে দেখে নিবো" পদ্ধতিতে দলের নেতাদের উসকিয়ে দেয়া কর্মীরা দেশপ্রেমিক নেতা-কর্মীদের মিছিল-মিটিং-এ হামলা ও শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে। এমনকি অনেক দেশপ্রেমিক নেতা-কর্মীদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এমনিভাবে শেখ মুজিব সভা-সমাবেশে প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে হুংকার দিয়ে বলেছেনঃ "পুঁটি মাছের মতো ভাজিয়া খাইবো, মুরগীর রানের মতো টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব, এদেশ হইতে টিকেট কাটাইবো, নির্মূল করিব, উৎখাত করিব ইত্যাদি। বর্তমানেও তাঁর উত্তরসুরী রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের কথায় চিন্তায় ও কর্মে কোন হেরফের হয়নি। বরং প্রতিপক্ষকে আরো তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বক্তৃতা বিবৃতি দেয়া হয়। এটাই ওদের চরিত্র। এইসব পেশীশক্তির দাপটে সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ ও প্রক্রিয়া দেশে অনুপস্থিত। প্রতিভাবান, দেশপ্রেমিক ও সৎ রাজনৈতিক নেতারা আজ রাজনীতি থেকে বিতাড়িত অথবা নিষ্ক্রিয়। এর ফলে আমাদের দেশের রাজনৈতিক অবস্থা হয়েছে ছোটকালে পড়া একটি ছড়ার মতো। ছড়াটি হলোঃ

ওরে ও নটরাজ!
তোর দেশে একি বিচার ?
ইঁদুরে বিড়াল ধরে খায়॥
শুনগো মা ভগবতী ,
শৃগালে গিলেছে হাতী,
পুঁটি মাছে তানপুরা বাজায় ॥

আজ থেকে একত্রিশ বছর আগে আমার একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে একটি জনপ্রিয় জাতীয় দৈনিকের উপ-সম্পাদকীয়তে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করা হয়েছিলো। পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে সে সময় এর প্রতিবাদ করতে পারিনি। অথচ ৩১ বছর আগে আমি যে বক্তব্য রেখেছিলাম তা সমাজে বা রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিফলিত হয়েছে। আমি যা আশংকা করেছিলাম তা 'সন্ধানী' নামের তাত্ত্বিকদের মূল্যায়নকে মিথ্যায় পরিণত করেছে। ইতিহাসের আলোকে এবং বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ৩১ বছর পর জাতির কাছে এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য নিবেদন করতে চাই। এর আগে আমার বক্তব্যকে সহজ ও সুস্পষ্টভাবে পাঠকদের কাছে প্রতিভাত করার উদ্দেশ্যে বহুল প্রচলিত একটি গল্প বলে নেই।

www.pathagar.com

এক দেশে এক গৃহস্থ পশু-পাখির কথা বুঝতো। একদিন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দেখে ব্যাঙেরা সভা ডাকছে। গৃহস্থ দূরে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনতে থাকে।

ব্যাঙেরা বলে, সামনে এক পাগলা পানি আসছে। সে পানি যে খাবে সেই পাগল হয়ে যাবে। ব্যাঙেরা সভায় সিদ্ধান্ত নেয় এ দেশে আর থাকা যাবে না। পাগলা পানি আসার আগেই আমাদের এ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে পাড়ি জমাতে হবে। ব্যাঙেরা সভা ভেঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে অন্য দেশে রওয়ানা দেয়। গৃহস্থ সেখান থেকে সোজা রাজদরবারে গিয়ে রাজাকে এ সংবাদ জানায়। রাজা সংবাদ শুনে উজিরের পরামর্শ চায়। উজির অনেক ভেবে-চিন্তে রাজাকে পরামর্শ দেয়– পাগলা পানি আসবার আগে ভাল পানি কলস আর মটকায় ভরে রাখলে আর কোন অসুবিধা নেই। এ কথা শুনে রাজা বলেন, তাহলে রাজ্যের সকল প্রজাদের বলে দেন যেন তারা এখন থেকে ভালো পানি মটকায় ভরে রাখে।

উজির বলেন, 'রাজ্যের সব লোকের পানি রাখার দরকার নেই। আমরা রাজপুরীতে যারা আছি তারা ভালো থাকলেই চলবে। পাগলা পানি খেয়ে যখন রাজ্যের প্রজারা পাগল হয়ে মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি করবে আমরা তখন মজাছে রাজত্ব করবো।' উজিরের 'বুদ্ধিমত' রাজা রাজপুরীর জন্য এক বছরে যত পানি দরকার সব পানি ভরে রাখার হুকুম দেয়। রাজার লোকেরা অনেক কলসী-মটকা কিনে ভাল পানি ভরে রাখে। কিছুদিন পর সেই পাগলা পানির ঢল আসে। পানি খেয়ে রাজ্যের সব প্রাণী পাগল হয়ে যায়। তারা নাচতে নাচতে কেবল একই বুলি গায়ঃ 'রাজার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' এদিকে ভাল পানি খেয়ে রাজা, উজির এবং রাজপুরীর সবাই বলে, 'আহারে, পাগলা পানি খেয়ে প্রজারা সব পাগল হয়ে গেছে।'

প্রজারা রাজাকে ধরার জন্য দলে দলে রাজবাড়ীর দিকে ছুটে। লাখ লাখ লোক রাজবাড়ী ঘেরাও করে জিনিসপত্র ভেঙ্গে চুরমার করতে থাকে। রাজা বলেন, 'উজির এখন উপায়?' উজির বলেন, 'রাজা মশায় এত পাগলকে সৈন্য ছাড়া থামানো যাবে না। আপনি সৈন্যদের হুকুম দিন এদেরকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দিক।' কিন্তু রাজা দেখে সৈন্যরাও পাগলা পানি খেয়ে প্রজাদের সাথে একজোট হয়ে সব ভেঙ্গে-চুরে একাকার করছে। রাজপুরীর যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই কেটে ফেলছে। আর সকলের মুখে একই কথা– 'রাজার মাথা খারাপ হইছে, রাজারে ধর।'

রাজার মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি আসে। রাজা সবাইকে ডেকে বলেন, 'যত ভালো পানি আছে কলস-মটকা ভেঙ্গে সব ফেলে দাও। জলদি করে সবাই গিয়ে পাগলা পানি খাও।' রাজা-রানী ও রাজপুরীর সবাই গিয়ে লাফ দিয়ে রাজবাড়ীর দীঘিতে গিয়ে পড়ে। সেখানে ছিল প্রচুর ঢলের পাগলা পানি। সবাই পাগলা পানি খাবার পর সব ঠিক হয়ে যায়।

উজিরের কুপরামর্শে জীবন বিপন্ন হবার পর রাজার মধ্যে শুভবুদ্ধির উদ্রেক হয়। তিনি ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে শাসক ও শাসিতের ব্যবধান ঘুচিয়ে নিজের জীবন ও সিংহাসন রক্ষা করেন। বস্তুত শাসকরা ভাল হলেও এক শ্রেণীর আমলা-বুদ্ধিজীবীরা তাদের ভাল থাকতে দেয় না। এসব বুদ্ধিজীবী-আমলাদের সংখ্যা যে

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দলে বেশী বা তাদের উপর নির্ভরশীল সে দলও ডুবে; জাতিকেও ডেবায়। বাংলাদেশের গত ৩১ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস তাই বলে।

অনেক ত্যাগ, অনেক রক্ত আর অনেক সংগ্রামের পথ ধরে ১৯৪৭ সালে বৃটিশের গোলামী থেকে আমরা অব্যাহতি পেয়েছিলাম। কত পথ অতিক্রম করে কত আঁধার রাতের সীমানা পেরিয়ে, কতো হাবিলদার রজব আলী, কতো তিতুমীরের শাহাদৎ, কত ফকীর মজনু ও শমশের গাজীর সংগ্রাম--১৮৫৭ সালের আজাদী আন্দোলন, জাস্টিস আমীর আলী ও নওয়াব আবদুল লতীফের বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম খেলাফত আন্দোলনের পথ ধরে অবশেষে মুসলিম হোমল্যান্ডের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু হোমল্যান্ডের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলেও মীরজাফর ও জগৎশেঠ প্রেতাত্মাদের চক্রান্ত থেমে থাকেনি। অংকুরেই জাতিকে বিভক্ত ও দুর্বল করার জন্য বেছে নেয় বিভিন্ন স্পর্শকাতর ইস্যু।

১৯০ বছরের ইংরেজ-হিন্দুদের সীমাহীন শোষণের ফলে শিক্ষায়, সভ্যতায় ও সম্পদে সমৃদ্ধ পূর্বাঞ্চলের জনগণ চাষা-ভূষায় পরিণত হয়েছিলো। ১৯০ বছরের শোষণের শিকার একটি জাতিকে রাতারাতি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করা আলাদিনের অলৌকিক চেরাগ ছাড়া কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। তবুও বলবো কতিপয় অপরিণামদর্শী রাজনৈতিক নেতাদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং ক্ষমতায় যাবার কামড়াকামড়ির ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক স্বপ্ন আশানুরূপ বাস্তবায়িত হয়নি। এই বাস্তবায়িত না হবার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আর এর সুযোগ গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক চক্র ও তাদের এদেশীয় দালালেরা।

আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের শিক্ষায় বলতে পারি ভারত কোন দিনই আমাদের বন্ধু হতে পারে না। তাই ষাট দশকে আমার রাজনৈতিক ভূমিকা ছিলো ভারত এবং সেবাদাসদের বিরুদ্ধে; দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে নয়। একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক রাজনীতিক নিজকে নিঃস্ব করে চায় দেশ ও জাতির কল্যাণ। এঁরা দেশ ও জাতিকে কিছু দিতে চায়; নিতে চায় না। কিন্তু বর্তমানে রাজনীতির দর্শন হয়ে পড়েছে দেশ ও জাতির কল্যাণ নয়; ব্যক্তি ও পারিবারিক কল্যাণ। ফলে আগে রাজনীতি করে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা নিঃস্ব হয়েছে; এখন রাজনীতি করে অগাধ সম্পদের মালিক হচ্ছে। আমরা এই অসৎ রাজনীতির বিরুদ্ধে ছিলাম বলেই তৎকালীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠির যেমন চক্ষুশূল ছিলাম; ঠিক তেমনি এদেশীয় একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের অপপ্রচার ও পেশীশক্তির শিকার হয়েছিলাম। এসব রাজনৈতিক দলের কতিপয় নেতার স্বরূপ কি ছিলো অনেক প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা এবং সাংবাদিকের লেখা গ্রন্থ পাঠ করলে বিস্তারিত জানা যাবে। এখানে দৃষ্টান্ত হিসাবে ২/১ টি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।

দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক মরহুম মানিক মিয়া ছিলেন আজীবন কট্টর আওয়ামী লীগ সমর্থক। কাজেই মরহুম শেখ মুজিব সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মরহুম মানিক মিয়া তাঁর 'পাকিস্তানের রাজনীতির পঞ্চাশ বছর গ্রন্থে' লিখেছেনঃ

www.pathagar.com

---কে,এস,পি'র কোয়ালিশনে যোগদানের বিষয়টা এমনইভাবে পন্ড হইয়া যাওয়ায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হইলাম। সৈয়দ আজিজুল হক অবশ্য ঢাকায় ফিরিয়া বিবৃতি দিলেন যে, আলোচনা অব্যাহত থাকিবে। বেচারা কে,এস,পি নেতাদের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হইল। সোহরাওয়ার্দীর কোয়ালিশনে যোগদানের আশায় তাঁরা দল ভাঙিলেন অথচ সেই আশাও পূর্ণ হইল না। শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরিয়া আসার পর তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, শহীদ সাহেবের বিবৃতিতে এমন কতকগুলো কথা ছিল যা বাদ না দিলে আওয়ামী লীগের ক্ষতি হইত। আমি 'মর্নিং নিউজে' প্রকাশিত শহীদ সাহেবের বিবৃতিটি ছিঁড়িয়া ফেলার খবরটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি তা অস্বীকার করিয়া সর্বৈ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। তখন আমি তাঁকে এই খবরের প্রতিবাদ করার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি জানাইলেন যে, করাচীতে তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমি যখন তাঁকে বলিলাম যে, এমন কোন প্রতিবাদ কোন পত্রিকায় আমি দেখি নাই, ঢাকার কোন পত্রিকাও এমন কোন বিবৃতি পায় নাই, তখন তিনি করাচীর কি-একটা সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর বিবৃতি বাহির হইয়াছে বলিলেন। বিষয়টির এইখানেই তিনি ইতি করিলেন; প্রতিবাদমূলক কোন বিবৃতি তিনি আর দিলেন না।

মুখ্যমন্ত্রীর পলিটিক্যাল সেক্রেটারী জমিরুদ্দিনের বাসভবনে আবার কে,এস,পি'র কোয়ালিশনে যোগদানের ব্যাপারে কে,এস,পি ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সম্মিলিত হইলেন। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শহীদ সাহেবকে দেখিয়া মনে হইল তিনি যেন কোন বিশেষ ব্যাপারে কিংকর্তব্য স্থির করিতে পারিতেছেন না। পরে অবশ্য জানা গেল যে, কে,এস,পি'র আওয়ামী কোয়ালিশনে যোগদানের ব্যাপারটাই তাঁকে এমনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়াছে, কারণ তাঁর মফস্বল সফরকালে আওয়ামী লীগের দলীয় কর্মীরা নাকি কে,এস,পি'র আওয়ামী কোয়ালিশনে যোগদানের ব্যাপারে বিরোধিতা প্রকাশ করিয়াছে। জমিরুদ্দিনের বাসভবনে আহুত এই সভা সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে শেখ মুজিব অবহিত ছিলেন কিনা আমি জানি না। তিনি আচমকা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সিঁড়ি কোঠায় দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জমিরকে ধমক দিয়া বলিলেন, "আমার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র।" তাঁর এই আচরণে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, আওয়ামী কোয়ালিশনে কে,এস,পি'র যোগদান তাঁর কাম্য নয়।

শেখ মুজিবের আচরণে সভায় নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিল। দুঃখে-ক্ষোভে-বিস্ময়ে সবাই স্তব্ধ হইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পর শহীদ সাহেব স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "দলের লোকেরা কে,এস,পি'র কোয়ালিশনে যোগদানের বিরোধিতা করিতেছে। কি যে করিব স্থির করিতে পারিতেছি না।" এই বলিয়া তিনি গাড়িতে উঠিলেন। করাচী যাইবেন। আমিও তাঁর সহিত গাড়িতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্যার, কি হইল?" তিনি জওয়াব দিলেন, "কিছুই হয় নাই; দলীয় বিরোধ আমার আর ভাল লাগে না। যা হয় হোক, প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্য আমার আর মোহ নাই।"

কে,এস,পি'র কোয়ালিশনে যোগদানের প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে শেখ মুজিবুর রহমান জানাইলেন যে, মাওলানা ভাসানী তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, তাঁর দলের

www.pathagar.com

সমস্ত পরিষদ সদস্য আওয়ামী লীগ কোয়ালিশনকে সমর্থন দিতে প্রস্তুত আছেন। এই কথায় শহীদ সাহেব মন্তব্য করিলেন যে, ন্যাপের সমস্ত সদস্য যদি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাকে সমর্থন দেয়, তবে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে কে,এস,পি নিয়া কোয়ালিশন ভারি করার প্রয়োজন নাই।

খানাপিনা শুরু হইল। এদিকে বার বার মোহন মিয়া টেলিফোন করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় তাকে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। খানাপিনা শেষে সেই রাত্রেই ভাসানী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই ব্যাপারে চূড়ান্ত করার জন্য আমি শেখ মুজিবকে তাগাদা দিলাম। তিনিও রাজী হইলেন। গভীর রাত্রে খবর নিয়া জানিলাম, শেখ মুজিবের সাথে মাওলানা সাহেবের সাক্ষাৎ হয় নাই, পরদিন হইবে। শেখ মুজিবই আমাকে এই কথা জানাইলেন।

কে,এস,পি'র সাথে আলোচনার পথ এইভাবে পুনরায় রুদ্ধ হইল। এই নিয়ে তিন-তিন বার একমাত্র শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত খেয়ালে কে,এস,পি'র আওয়ামী কোয়ালিশনে যোগদান বাধাপ্রাপ্ত হইল। কি কারণে এবং কোন ব্যক্তিগত বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তিনি এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলেন তা আজ পর্যন্ত সুস্পষ্ট নয়, তবে তার এই প্রতিবন্ধকতা যে আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তানের কি সর্বনাশ ডাকিয়া আনিল, তিনি এখনও তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কি-না জানি না; তবে ইতিহাস কোন ঘটনাই ভোলে না; কোন অন্যায়কে ক্ষমা করে না। তিনি এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করিলে প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে নাজেহাল হইতে হইত না। আওয়ামী কোয়ালিশন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইত, পরিষদের হানাহানি ঘটিত না, ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী পরিষদ কক্ষে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেন না এবং কেন্দ্রীয় চক্র শাসন-ক্ষমতা অধিকার করিয়া দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তনের সুযোগ ও অজুহাত পাইত না; পাকিস্তানের ইতিহাসের ধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইত। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক কোন্দলকে মূলধন করিয়াই ইস্কান্দার মীর্জা ও জেনারেল (বর্তমানে ফিল্ড মার্শাল) মুহাম্মদ আইয়ুব খান দেশকে বর্তমান পর্যায়ে ঠেলিয়া দিয়াছেন। (পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর/ তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া পৃঃ ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৯০, ৯১)।

তৎকালীন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হওয়া সত্ত্বেও ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে "সংখ্যাসাম্য" মেনে নিয়ে পূর্বাঞ্চলকে শোষণের ক্ষেত্র তৈরী করে দেয়। এর প্রতিবাদ করায় শেরে বাংলাকে অপমান অপদস্থ পর্যন্ত করা হয়। এছাড়া মন্ত্রী পরিষদ গঠনের সময় শেখ মুজিবকে মন্ত্রী সভায় অন্তর্ভুক্ত না করায় তিনি শেরে বাংলার মুখের উপর বৃদ্ধাঙ্গুলি নেড়ে-চেড়ে চটাং-চটাং কথা বলেছিলেন। আর তার উত্তরে শেরে বাংলা দুঃখ করে বলেছিলেন, "যে ছেলে আশি বছরের বুড়োকে বেইজ্জত করতে দ্বিধা করেনি, সে এদেশের সম্ভ্রম ভূলুণ্ঠিত করতে দ্বিধা করবে না-এটা তোমরা দেখে নিও।" শেখ মুজিব সম্পর্কে শের-ই-বাংলা এবং মানিক মিয়ার ভবিষ্যৎবাণী পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অলি আহাদ তাঁর 'জাতীয় রাজনীতিঃ ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫' গ্রন্থে শেখ সাহেবের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে লিখেছেনঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাঁটি অনুচর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একই পদার্থের তৈরী। ক্ষমতার লোভে দেশ ও জাতিকে বিকাইয়া দিতে তাঁহারা উভয়েই বিবেকের সামান্যতম দংশনও বোধ করেন নাই। (জাতীয় রাজনীতিঃ ১৯৪৫-৭৫, পৃঃ ১৯৬)।

শেখ সাহেবের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একটি নিরপরাধ কিশোরকে প্রাণ দিতে হয়েছে। চকবাজারের এক পানের দোকানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের এক কারারক্ষী (Jail Warden) মকবুল হোসেন 'বাকী' খরিদ বাবদ বার আনা বা পঁচাত্তর পয়সা ঋণী ছিল। মকবুল হোসেন পুনরায় বাকী খরিদ করিতে চাহিলে দোকানী বাকি বিক্রি করিতে অস্বীকৃতি জানায় ও পূর্বেকার বাকি পঁচাত্তর পয়সা পরিশোধ করিতে বলে।

ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে বচসার সূত্রপাত হয় ও ঘটনা ক্রমান্বয়ে হাতাহাতি ও ক্রমান্বয়ে মারামারির রূপ গ্রহণ করে। এই তুচ্ছ ঘটনাটিই অচিরে জনতা ও কারারক্ষীদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। রাজনৈতিক ফায়দা লুটার মতলবে খবর পাওয়া মাত্র পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ সাধারণ সম্পাদক ও পূর্ববংগ আইন পরিষদের সদ্য নির্বাচিত সদস্য শেখ মুজিবর রহমান এক উচ্ছৃঙ্খল জনতার কাফেলাকে নেতৃত্ব দিয়া জেলগেটে আক্রমণ করেন। উচ্ছৃঙ্খল জনতা জেলগেট সন্নিকটবর্তী সশস্ত্র পুলিশদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অগ্রসর হইলে আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার অপরিহার্য কারণেই জেল গেইটে প্রহরারত সশস্ত্র পুলিশ গুলি বর্ষণ করিতে বাধ্য হয়। আই,জি,পি সামছুজ্জোহা সশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ও আক্রমণকারী জনতাকে ছত্রভংগ করার প্রচেষ্টায় শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ঘটনা অতি সামান্য, অতি তুচ্ছ এবং অনুল্লেখযোগ্য।

ফলশ্রুতিতে একটি নির্দোষ নিষ্পাপ কিশোরকে পুলিশের গুলিতে আত্মাহুতি দিতে হইয়াছিল। অকারণেই খালি এক মায়ের বুক। সস্তা জনপ্রিয়তাকামী, শেখ মুজিবুর রহমানের ঘটনার যথার্থতা বা গুণাগুণ বিচার অবান্তর। উল্লেখ্য যে, আমাদের অনুরোধে নেহায়েত অনিচ্ছাকৃতভাবেই জনাব সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবুর রহমানকে মন্ত্রীসভায় গ্রহণের জন্য শেরে বাংলাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেরে বাংলা শেখ সাহবকে মন্ত্রীসভায় নিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃতি জানান। ফলে গোটা আওয়ামী লীগের আর কাহাকেও মন্ত্রীসভায় নেওয়া হয় নাই। ইহাই ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণ আর ইহারই পরিণাম সদ্য গঠিত ফজলুল হক সরকারের বিরুদ্ধে তাঁহার এই অভিযান। (জাতীয় রাজনীতিঃ ১৯৪৫-৭৫/ অলি আহাদ/পৃষ্ঠাঃ ২১৩-২১৫।

যে সব নেতা-নেত্রী জাতিকে নানাভাবে নানা কৌশলে সস্তা জনপ্রিয়তার মাধ্যমে যে যত বেশী ফাঁকি দিতে পেরেছেন তিনি তত বড় নেতা-নেত্রী হয়েছেন। আর যে

www.pathagar.com

সব নেতা নিজের বিবেকের তাগিদে জাতিকে ফাঁকি দিতে পারেননি তাঁদেরকে আমরা যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিতে পারিনি। এই পূর্ব বাংলার উন্নয়ন প্রকৃতপক্ষে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের সময় থেকে শুরু হয়। ১৯০ বছরের শোষণের ফলে এখানে কোন আন্তর্জাতিক মানের হোটেল ছিলো না। এই শূন্যতা পূরণ করার জন্য তিনি সরকারী আনুকূল্যে প্রথম হোটেল শাহবাগ নির্মাণ করেন, যা বর্তমানে পিজি হাসপাতাল। তাঁর হাতেই গড়ে ওঠে ঢাকার নিউ মার্কেট এবং আজিমপুরের সরকারী কলোনী, ধানমন্ডির আবাসিক এলাকা। ইস্কাটনে তাঁর একটা ছোট্ট বাড়ী ছিলো, অথচ বিরোধীরা সাধারণ জনগণের কাছে প্রচার করেছে তিনি নাকি এক বিরাট প্রাসাদ বানিয়েছেন যেখানে তাঁর স্ত্রী সোনার খাটে শুয়ে থাকেন। সে প্রাসাদের বাথরুমগুলো নাকি এমনভাবে তৈরী যে সেখানে গেলে যে কারো ঘুম এসে যায়। এভাবে মরহুম নূরুল আমিনের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করে জাতিকে বিভ্রান্ত করা হয়েছিলো। নূরুল আমিন সাহেব কোনদিন এই সব মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করেননি। তবে 'নূরুল আমিনের কল্লা চাই' এর প্রতিবাদে তিনি প্রকাশ্য জনসভায় প্রায়ই বলতেন, "আমি একুশে ফেব্রুয়ারীর ছাত্র মিছিলের উপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়ে থাকি। এর প্রমাণ করতে পারলে আমি ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলতে প্রস্তুত।" কিন্তু তাঁর এই চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণ করেনি। বিচারের জন্য দাবী জানায়নি। রাজনৈতিক হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য শুধু এরা তাঁর কল্লা চেয়েছে। সুষ্ঠু তদন্তের ফলে যদি একুশে ফেব্রুয়ারী ঘটনার বিচার হতো তাহলে অনেকের কুৎসিৎ স্বার্থবাদী রাজনীতির মুখোশ উন্মোচন হয়ে যেতো।

ভাষা আন্দোলনকে পুঁজি করে এদেশে শুরু হয়েছে সুবিধাবাদী ও প্রাসাদ ষড়যত্রের রাজনীতি। পশ্চিমা দাদা বাবুরা হিন্দী ভাষার কাছে আত্মসমর্পণ করে পূর্বাঞ্চলে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠার জন্য নির্লজ্জভাবে ইন্ধন যুগিয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্বাঞ্চলের কতিপয় নেতাকে দাবার গুটি হিসাবে ব্যবহার করে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ঘন ঘন ক্ষমতার পালা বদল ঘটিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিলো। এমনকি প্রাদেশিক পরিষদে ডিপুটি স্পীকার শাহেদ আলীকে হত্যা করে গণতন্ত্রকে নির্বাসিত করেছিলো। এসব নেতারা বিরোধী দলে থাকাকালীন হয়েছে বাঙ্গালী ও গণতন্ত্র প্রেমিক; আর ক্ষমতায় গিয়ে হয়েছে পাকিস্তানী প্রেমিক।

১৯৫৪ সালে নির্বাচনে এদেশের জনগণ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার পক্ষে ম্যান্ডেট দিয়েছিলো। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় গিয়ে এক দফাও বাস্তবায়ন করেনি। এমনকি ১৯৫৬ সালে ক্ষমতাসীন সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্বশাসন দেয়া হয়েছে।

ইসকান্দর মীর্যা, গোলাম মোহাম্মদ ও শিল্পপতি হারুন গংরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের তথাকথিত সেই দেশপ্রেমিক নেতাকে ব্যবহার করে তিন নেতাকে ঐক্যবদ্ধ হতে দেয়নি। শেখ সাহেব মাঠে ময়দানে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাইশ পরিবারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতেন আবার পশ্চিম পাকিস্তানে গেলে বাইশ পরিবারের এক পরিবার জনাব হারুনের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করতেন পরম আয়েশে। প্রকৃতপক্ষে শেখ সাহেবই ছিলেন এদেশের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের অন্যতম ক্রীড়নক।

www.pathagar.com

১৯৫৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী টাঙ্গাইলের কাগমারীতে আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সুস্পষ্টভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। মওলানা ভাসানীর উপদল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবী তোলেন এবং পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিলের আওয়াজ তোলেন। উল্লেখ্য যে তখন কেন্দ্রে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং পূর্ব পাকিস্তানে মরহুম আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাওলানা ভাসানীর সমর্থনে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ইউনিয়ন একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। চতুর্দিক থেকে এই সভাকে ঘিরে সর্বাত্মক সাঁড়াশি আক্রমণ চালান হয়। এই অমানবিক নিষ্ঠুর প্রহারে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ও কর্মীগণ প্রাণভয়ে যে যে দিকে পারেন রুদ্ধশ্বাসে ছুটে পালান।

এরপর একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালের ২৫শে জুলাই ঢাকার 'রূপমহল' সিনেমা হলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় সমমনা রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের একটি গ্র্যান্ড কনভেনশন বা মহাসম্মেলনের আয়োজন করেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এ মহাসম্মেলনে অংশ নেন সীমান্ত গান্ধী বলে পরিচিত খান আবদুল গাফফার খান, তদীয় পুত্র ওয়ালী খান, প্রখ্যাত বামপন্থী নেতা মিঞা ইফতেখার উদ্দীন প্রমুখ। বাস বোঝাই সন্ত্রাসী বাহিনী রূপমহল সিনেমা হলের সম্মেলনে প্রচন্ড হামলা চালায়। এ হামলায় তাদের সাথে যোগ দেয় পুলিশ বাহিনী। পুলিশ বাহিনী হামলাকারীদেরকে ছত্রভঙ্গ করার পরিবর্তে লাঠি, ইট-পাটকেল ও পচা ডিম নিয়ে রূপমহল সিনেমা হলের সামনে আক্রমণ চালায়। সেদিন পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্বপ্রথম দেখা যায়, গণতন্ত্রের নামাবলী অঙ্গে ধারণ করে চালায় ভয়াবহ শ্বেত-সন্ত্রাস। এই সম্মেলনেই জন্মলাভ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। পরদিন অর্থাৎ ২৬ জুলাই রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাস বা পূর্ণ শক্তি নিয়ে তান্ডবলীলা শুরু করে। ২৬ জুলাই পল্টন ময়দানে নবগঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জনসভার আয়োজন করা হয়। মওলানা ভাসানী ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য আসেন। ঝটিকা বাহিনী সর্বাত্মক শক্তি নিয়ে ন্যাপের জনসভায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। দক্ষিণে নবাবপুর রেল ক্রসিং, উত্তরে আজকের পুরানা পল্টন, পূর্বে মতিঝিল এবং পশ্চিমে কার্জন হল ও রেলওয়ে হসপিটাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই পাঁচ মাইল রেডিয়াসের বিস্তীর্ণ এলাকা এক ভয়াবহ কুরুক্ষেত্রে পরিণত হয়। সেদিন ছিলেন যারা তরুণ আজ তেতাল্লিশ বছর পর তারা সকলেই পক্ককেশ বৃদ্ধ। তেতাল্লিশ বছর আগের সেই দিনটির কথা মনে পড়লে এই পৌঢ় ও বৃদ্ধদের লোম আজও ভয়ে খাড়া হয়ে যায়। কয়েকশ' লোকের ঝটিকাবাহিনী শুধু ইট-পাটকেল ও পচা ডিম নিক্ষেপই নয়- লাঠির মাথায় ক্ষুরধার ব্লেড বেঁধে সেই লাঠি বেধড়ক পেটান পেটায়। অসংখ্য ন্যাপ সমর্থক ও কর্মীদের রক্তাপ্লুত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। জনসভার মূলক্ষেত্র পল্টন ময়দান ও তার আশপাশের এলাকায় পেটোয়া বাহিনী নারকীয় তান্ডব শুরু করে। সংসদীয় গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে পরিচালিত সেই শ্বেত সন্ত্রাসজনিত দক্ষযজ্ঞ কান্ডে মওলানা ভাসানীর জনসভা ভন্ডুল হয়ে যায়।

www.pathagar.com

ন্যাপ-বিরোধিতার এনাম হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবকে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দান করেন। তাঁকে প্রথমে পাকিস্তান টী-বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচন ও একটি দামী 'লিমুজিন' গাড়ী উপহার দেয়া হয়। তারপর প্রধানমন্ত্রী তার বিশেষ দূত হিসেবে শেখ মুজিবকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন তাকে এহেন মর্যাদা জ্ঞাপনে অস্বীকৃতি জানায়। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস, সেই রাশিয়াই তাকে ১৯৭২ সালে সর্বোচ্চ সম্মানসহ পরবর্তীকালে "জুলিওকুরি" শান্তি পুরস্কারেও ভূষিত করে।

এইভাবে ১৯৫৭ সালে রাজনীতিতে গুন্ডামীর যে ধারা প্রবর্তন করা হয় পরবর্তীকালে অন্যরা সেই পদচিহ্ন খুব বিশ্বস্ততার সাথে অনুসরণ করেন। মরহুম আইয়ুব খান যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং মরহুম আবদুল মোনেম খান যখন পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর তখন ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র ফ্রন্ট ছিল এনএসএফ বা জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশেষ করে ছাত্র রাজনীতিতে পেশীশক্তি হিসাবে হকিস্টিকের ব্যবহার প্রথম করে এই এনএসএফ। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত রাজনীতিতে গুন্ডামী তথা পেশীশক্তি প্রয়োগের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ও এখতিয়ার ছিল এনএসএফ-এর। ১৯৬২ সালের পর থেকে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী গ্রেফতারের পর থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক বাতাস অতি দ্রুত আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের অনুকূলে প্রবাহিত হতে থাকে। এই সাথেই ঘটে আওয়ামী লীগের লুপ্ত পেশীশক্তির উত্থান। যে প্রথিতযশা এডভোকেট আবদুস সালামের ক্ষুরধার প্রতিভা শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত করে আনতে সাহায্য করে পরবর্তীকালে নেহায়েত রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে সেই এডভোকেট সালামের জনসভার উপর ফ্যাসিবাদী হামলা চালিয়ে ঐ জনসভা পন্ড করে দেওয়া হয়। পল্টন ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় প্রচন্ড আক্রমণ চালালে আবদুল মালেকসহ তিনজন জামায়াত কর্মী মৃত্যুবরণ করে। *(তথা সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব/রূপকার '৯৩)*

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানকালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব শেখ সাহেবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর অফার দিয়েছিলেন। শেখ সাহেবও সম্মতি জানিয়েছিলেন। এর ফলে গোলটেবিল বৈঠক আহবান করা হয়েছিলো। এর প্রতিবাদে লাহোরের মুচি গেইটে ভুট্টো ও ভাসানী সাহেব যৌথভাবে এক জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। ভুট্টো তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেনঃ "আদমী বোলতা হ্যায় মাই শরাব পীতা হুঁ। ইয়ে বাত সহী হ্যায়। মাগার ম্যায় ইনসান কা খুন নেহি পীতা হুঁ। আওর ইয়ে লোক জো আভি মসনদ মে বৈঠা হুয়া হ্যায় ইয়ে লোক গরীব কা খুন পীতা হ্যায়।"

মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা ছিলো অধিকতর নাটকীয় -"ভুট্টো আমীর হ্যায়। হাম গরীব হ্যাঁয় মাগার ভুট্টো আপনা বহুত সে জায়দাদ গরীব কো আন্দার তসমলীম কর দিয়া। ইসলিয়ে হাম উনকো আপনা সাথ্ লিয়া হ্যাঁয়। আওর ইয়ে এলিট লোক আপনা জায়দাদ বানানে কে লিয়ে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স মে বৈঠা হুয়া হ্যায়।

www.pathagar.com

হাম মুজিবকো হুঁশিয়ার কর দেতে হ্যাঁয় আগার ইয়ে, এলিট লোককো সাথ মিলকে গরীবকো বরবাদ করনেকা সাজিস করো তো, হাম তোমকো ইস্ট পাকিস্তান মে যানে কা রাস্তা বন্ধ করেঙ্গে।"

গোলটেবিল বৈঠকের সূত্র ধরে আইয়ুব একটা সমঝোতার সূত্র খুঁজতে চেয়েছিলেন। এ সূত্র তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল মুজিবের এককালীন বস ইউসুফ হারুন। তারই মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয়েছিল শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। দেশে পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তন করা হবে এবং এ ব্যবস্থায় আইয়ুব হবেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। পাকিস্তানের দু অংশেই তখন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন এর পিছনে পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টো এবং পূর্ব পাকিস্তানে ভাসানীর ভূমিকা ছিল যথেষ্ট। টলটলায়মান গদি ঠেকানোর জন্য আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী মুজিবকে আইয়ুব জেল থেকে বের করে নিয়ে আসেন এবং গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের সুযোগ করে দেন। ইউসুফ হারুনের এই সমঝোতামূলক প্রচেষ্টার কথা ফাঁস হয়ে যায় আর্মির সিনিয়র জেনারেল পীরজাদার মাধ্যমে। পীরজাদা ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টোর খুবই ঘনিষ্ঠ। আর্মির একটা অংশের সাথে ভুট্টোর ছিল দহরম মহরম। এ অংশটা চায়নি মুজিব প্রধানমন্ত্রী হোক। এরাই পরবর্তীকালে ইয়াহিয়া খানের মাধ্যমে দেশে আবার সামরিক শাসন জারী করে। এভাবেই মুজিব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তখনকার মত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বঞ্চিত হন। মুচি গেটের জনসভায় ভুট্টো ও ভাসানী মুজিবকে পিছন দরজা দিয়ে এভাবে প্রধানমন্ত্রী বানানোর উদ্যোগকেই ষড়যন্ত্র বলে ইংগিত করেছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে ঢাকা এয়ার পোর্টে মাহমুদ আলী ও মৌলভী ফরিদ আহমদকে অপহরণ করা হয়।

এ গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে আরেক চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায় তৎকালীন রাজনৈতিক নেতা ইব্রাহিম হোসেন এর "ফেলে আসা দিনগুলো" শিরোনামে স্মৃতিচারণমূলক লেখায়। তিনি লিখেছেনঃ

আইয়ুবের রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের ফলাফল ছিল শূন্য। আমরা যখন লাহোরে তখন সবুর খান সাহেব আমাদের একদিন মুজিবের কাছে পাঠালেন বৈঠকের ফলাফল জানতে। আমার সাথে ছিল কাজী কাদের। মুজিব তার দলবল নিয়ে পিন্ডির ইস্ট পাকিস্তান হাউসে উঠেছিল। আমাদের আসবার কথা শুনে সে আমাদের ডেকে নিয়ে তার রুমে বসালো।

আমরা বৈঠকের ফলাফল জানতে চাইলে মুজিব প্রথমে বৈঠকের কিছু বর্ণনা দিল। শেখ মুজিব বৈঠকে নূরুল আমিন সাহেবের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করলো যা ছিল আমাদের ধারণাতীত। মুজিব বললো, আমার আজকে মন ভরে গিয়েছে। কনফারেন্সে নূরুল আমিন সাহেব বাংলাদেশের মানুষদের পক্ষে যা বললেন তা আমি কখনো চিন্তা করিনি। ওঁর (নূরুল আমিন) মতো আমার এতো লেখাপড়াও নেই, বিদ্যাবুদ্ধিও নেই। বাংলাদেশের মানুষদের নিয়ে তিনি যে এত কিছু ভাবতে পারেন আজ তা বুঝতে পারলাম। আগামী দিনের সংগ্রামে তাঁকে আমাদের সাথে এক সাথে পাবো এই বিশ্বাস নিয়ে আগামীকাল ঢাকা ফিরে যাচ্ছি। আক্ষেপের সুরে

www.pathagar.com

বললো, সব কিছুই সেটেলড হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর্মি সবকিছু আনসেটেলড করে দিলো। সেটেলড বলতে সে ইউসুফ হারুনের প্রচেষ্টায় পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা বুঝিয়েছিল। আলোচনার এক পর্যায়ে মুজিবকে দেখলাম ভুট্টো ও ভাসানীর বিরুদ্ধে খুব ক্ষ্যাপা। মুজিব মুচি গেটে তাদের বক্তৃতার কথা শুনেছিল। বিশেষ করে ভারত ও মুজিবকে আক্রমণ করে ভাসানীর ভাষণ তার সহ্য হয়নি। মওলানা ভাসানী ঐ জনসভায় মুজিবকে ভারতের চর বলে গালি দিয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের ঘটনাবলীর সাথে ইয়াহিয়ার সংশ্লিষ্টতাকে উল্লেখ করে যারা তাকে দোষারোপ করে তারা তার ক্ষমতা গ্রহণ থেকে পাকিস্তানের বিপর্যয় পর্যন্ত পুরো ঘটনার উপর নজর দেয় না। ইয়াহিয়ার কোন কর্মকান্ডে তার কোন ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ প্রকাশ পায়নি। যেমনটা আইয়ুবের মধ্যে দেখা যেত।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তানের তখনকার রাজনীতি ইয়াহিয়া খানের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের জন্য অনুকূল ছিল না। তাছাড়া ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর মধ্যেও ছিল বিস্তর মতপার্থক্য। দেশের দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে আর্মির এই মতানৈক্য ইয়াহিয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক প্রতিবন্ধকতা আরোপ করেছিল বলে আমার ধারণা।

১৯৬৯ সালের অক্টোবরে লাহোরে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে কাইয়ুম খান সভাপতি, সবুর খান সাধারণ সম্পাদক এবং আমি ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার নির্বাচিত হই। কিন্তু এতদিন পর যখন ভাবি তখন বেদনার সাথে অনুভব করি, সেদিন মুসলিম লীগের মধ্যে আরেকটি উপদলই কেবল সৃষ্টি হয়েছিলো। আমাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রক্রিয়াকে মোটেই উৎসাহিত করলো না। বলতে দ্বিধা নেই পাকিস্তানের দুর্যোগের দিনে যে মুহূর্তে দরকার ছিল মুসলিম লীগের কর্মীদের মধ্যে ঐক্য সে মুহূর্তে আমরা দ্বিধা দ্বন্দ্ব আর অনৈক্যের জোয়ারে ভেসে গেলাম। ৭০-এর নির্বাচনের কালে আমরা মুসলিম লীগাররা তিনটি গ্রুপে (কাউন্সিল, কনভেনশন ও কাইয়ুম গ্রুপ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলাম। তার ফলাফল অবশ্য আমরা হাতে হাতেই পেয়েছি।

লাহোরের কাউন্সিল শেষে আমি হেকিম ইবতেজাউর রহমান, ফিরোজ আহমদ ডগলাস আর নূরুল ইসলাম এক সাথে বসে সিদ্ধান্ত নেই, আইয়ুব খানের সাথে দেখা করবো। দেশের ঘোরতর দুর্যোগের দিনে তার মতামত জানার জন্য কেন যেন আমাদের কৌতূহল হয়েছিল।

আইয়ুব খান তখন ইসলামাবাদে থাকতেন। আমরা লাহোর থেকে তার ইসলামাবাদের বাসায় গেলাম। তিনি উপর থেকে নেমে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। পাহাড়ের ধারে নিরিবিলি পরিবেশে বাড়ীর সামনের লনে আইয়ুব আমাদের নিয়ে বসলেন। তারপর প্রথমেই আন্তরিকতার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের খবর নিলেন।

"ইস্ট পাকিস্তান কা কিয়া হাল হ্যায়?" আমি এর উত্তরে বললাম, "ইস্ট পাকিস্তান মে আভি শেখ মুজিবর রহমান কা রাজ চল রাহা হায়। আপতো মুসলিম লীগ ছোড় দিয়ে হায়। মুসলিম লীগ কেইসি চলেগা।"

www.pathagar.com

তখন তিনি তার পরনের লংকোট তুলে পেটের বিরাট অপারেশনের দাগ দেখালেন। নিজের অসুস্থতার দিকে ইংগিত করে বললেন- "It is not possible for me to continue with this stage". তারপর বললেন, "হাম সব কুছ জানতা হ্যাঁয়। ইস্ট পাকিস্তান কো আলাদা করনে কে লিয়ে উয়ো সিক্স পয়েন্টস প্রোগ্রাম বাংগালী লোককা পাস হাজীর কিয়্যা হ্যায়। মাগার মুসলমান কে লিয়ে নেহি।" বলতে বলতে আইয়ুব অনেকটা বুক ভারী করে ইংরেজীতে মুজিব সম্পর্কে বললেন-'He is a snake, poisonous snake'.

আমি তাকে বেশ অভিযোগের স্বরে বললাম, "আগরতলা মামলায় আপনিই তো তাকে ছেড়ে দিলেন। অথচ তার শাস্তির বদলে এ মামলাই তাকে হিরো বানিয়ে দিল।" আইয়ুব তখন বললেন, "আগরতলা ষড়যন্ত্রের সব কাগজপত্র আমি দেখেছি। এটা একটা সত্য ঘটনা। আমি তাকে ফাঁসী দিতে পারতাম। কিন্তু তোমরা বাঙ্গালীরাই তাকে ঘরে ঘরে পূজো করতে। তোমাদের বাঙ্গালীদের জন্যই আমি কিছু করতে পারিনি।" তারপর তিনি বললেন, "Remember Allah. I tell you, he will be killed by his own people. He will be paid by his own coin." আলোচনার এক পর্যায়ে মাওলানা ভাসানীর কথা উঠলো। আইয়ুব তার বেশ তারিফ করলেন। আঙ্গুলের করে হাত দিয়ে তিনি বললেন, "No. 1. He is a good Muslim. No. 2. He is anti Indian. Go and work with him."

মুজিব আর ভাসানী সম্পর্কে আইয়ুবের এই মূল্যায়ন ছিল তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল। ইতিহাসের রায় নিয়ে যারা ভাবেন, তাদের কাছে এ মূল্যায়নের অবশ্যই গুরুত্ব আছে।

---স্বীকার করতেই হবে ষাটের দশকে এসে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান উন্নয়নের দিক থেকে খুব কাছাকাছি চলে আসতে শুরু করেছিলো। আমার মনে পড়ছে ষাটের দশকের শেষে এসে ইউনিভার্সিটিতে আমার সিনিয়র শফিউল আজম প্রদেশের চীফ সেক্রেটারী হয়েছিলো। প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই বাঙ্গালী অফিসাররা ডিসি হিসেবে নিয়োগ পেতে শুরু করলো। সেনাবাহিনীতে বাঙালীদের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছিল ৩১%। যেখানে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে বাঙালী সৈন্য খুঁজে পাওয়া যেত না। কিন্তু শেখ মুজিবের কাছে এগুলোর কোন গুরুত্ব ছিল না। সে ছিল প্রকৃত অর্থে একটা পলিটিক্যাল এজিটেটর, রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। এ কথাটা পরে তার সম্পর্কে বলেছিল ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লেঃ জেঃ অরোরা। মুজিব যখন পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতা হয়ে উঠতে শুরু করলো তখন তার সাথে এক অদ্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে অবাঙালী কতিপয় শিল্পপতির সাথে। আমার মনে পড়ছে সিন্ধুর মুসলিম লীগ নেতা ইউসুফ হারুন ছিল আলফা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের মালিক। তার পূর্বাঞ্চলীয় সদর দফতর ছিলো ঢাকার গুলিস্তানে। ইউসুফ হারুন আলফা ইন্স্যুরেন্সের পূর্বাঞ্চলীয় জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে শেখ মুজিবকে পছন্দ করে। সে তাকে নিয়মিত বেতন ভাতা দিতো। শোনা যায় ইউসুফ হারুন তার পার্টির খরচের জন্যও

www.pathagar.com

টাকা পয়সা দিতো। বলতে গেলে মুজিব তার পার্টির কাজকর্ম করতো আলফা ইন্স্যুরেন্সের অফিসেই বসে।

ইউসুফ হারুনের এই মুজিব প্রীতির একটা কারণ ছিল। ইউসুফ হারুন ছিলো জমিদার এবং পারিবারিকভাবে তারা ছিলো ভুট্টো পরিবারের প্রতিদ্বন্দ্বী। ভূট্টো ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতা। হয়তো ইউসুফ হারুন মুজিবের জনপ্রিয়তাকে ভূট্টোর বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে চেয়েছিল।

মুজিবের সাথে আদমজীদেরও সম্পর্ক ছিলো। আব্দুল আউয়াল বলে চাঁদপুরের এক ছাত্রলীগ নেতা ছিল আদমজী গ্রুপের কর্মচারী। তাকে সবাই আউয়াল আদমজী বলে ডাকতো। এই আউয়ালের মাধ্যমে মুজিব আদমজীদের কাছ থেকে আর্থিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতো। তখন পূর্ব পাকিস্তানে বাবনা ফুড প্রসেসিং ইন্ডাষ্ট্রি ছিল বেশ নামকরা। এক পাঞ্জাবী শিল্পপতি ছিল এটার মালিক। এরা জ্যাম জেলী ইত্যাদি প্রস্তুত করতো। একবার মোহন মিঞার সাথে আমি বাবনা ইন্ডাষ্ট্রির মালিকের এলিফ্যান্ট রোডের বাসায় দাওয়াত খেতে গিয়েছিলাম। তার ড্রয়িং রুমে যেয়ে দেখি ঘরের দেয়ালে শেখ মুজিবের বিরাট এক ছবি। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল, মুজিব আমাদের নেতা। সেই বাসায় তখন মুজিবের এক বোনের জামাইকেও দেখলাম। সে ছিল এদের কর্মচারী। মুজিব এই পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীর কাছ থেকেও অর্থ গ্রহণ করতো। এ ধরনের দু'একটি ঘটনার উল্লেখ একারণে করলাম যে শেখ মুজিব গোপনে এসব অবাঙ্গালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করতো। অথচ তাদেরই বিরুদ্ধে শোষণের অভিযোগে রাজপথ মুখর করতো। মুজিবের একটা সুবিধাও ছিলো। অবাঙ্গালীদের শোষণের কথা বলে সে তাদের কাছে একটা প্রেসার এলিমেন্ট হিসেবে দাঁড়িয়ে গেলো। একারণে অবাঙ্গালীরা অনেক সময় ভয়ে তাকে স্বেচ্ছায় টাকা পয়সা দিয়ে আসতো। বলাবাহুল্য অস্তিত্ব রক্ষার ভীতিই কাজ করতো তাদের এ ধরনের অর্থ প্রদানের পেছনে।

মুজিব যখন ১৯৬৯ সালে জেল থেকে মুক্ত হয়ে আইয়ুবের গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্য যায় তখন লাহোর থেকে গাড়ীসহ যাবতীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছিলো আদমজী। আমি তখন লাহোরে। সেখানে আউয়ালের সাথে দেখা। সে আমাকে বললো, বড় ভাই এর সব ব্যবস্থা করতে এসেছি।

১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার মতো একটা গুরুতর ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হয় এটিই আগরতলা ষড়যন্ত্র নামে পরিচিত। ভারতের সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার এই কার্যে মুজিব ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবর সহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এই মামলায় শেখ মুজিব এতদসংক্রান্ত সব অভিযোগ অস্বীকার করে। শেখ মুজিব দীর্ঘদিন ধরেই পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় স্বার্থরক্ষা করে চলেছিল। ভারতীয় স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই সে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালীর অধিকারের কথা বলতো। আর ভারতও জানতো বাঙালী জাতীয়তাবাদের ধারণা যত স্ফীত হবে পাকিস্তানের বুনিয়াদ

www.pathagar.com

তত দুর্বল হবে। সেই পথ ধরেই পাকিস্তান দ্বিখন্ডিত হয়ে যাবে। যা ছিল ভারতেরই আরাধ্য। বাংলাদেশ হওয়ার পর শেখ মুজিব যে এই সব ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিল, সে যে ভারতীয় স্বার্থের রক্ষক হিসেবে এদেশে কাজ করতো তা নিজেই স্বীকার করেছে। ১৯৭২ সালে ৮ ও ৯ই এপ্রিল আওয়ামী লীগের দলীয় কাউন্সিলে দেয়া এক ভাষণে সে বলেছিল ১৯৪৭ সালে এদেশের স্বাধীনতা সত্যিকারের স্বাধীনতা ছিল না। আমি কোন দিনই এ স্বাধীনতার উপর বিশ্বাসী ছিলাম না। আমি বহুপূর্ব থেকেই এদেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে আসছিলাম। শেখ মুজিব আরো বলেছিল, সর্বপ্রকার সাহায্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য ভারতের সংগে পূর্বেই তার চুক্তি হয়েছিল। সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ভারত সাহায্য ও আশ্রয় দেবে এসব চুক্তি সে আগে থেকেই সম্পন্ন করেছিল।

ষড়যন্ত্র মামলা যখন চলছিল তখন তার পক্ষ নেয় ঢাকা ইউনিভার্সিটির কতিপয় বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী শিক্ষক। এসব শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থান অর্জিত হয়েছিল পাকিস্তান হবার ফলেই। কলকাতার জগতে এদের কোন স্থান ছিল না। অথচ এরাই এখন মুজিবের সাথে মিলেমিশে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো।

এরকম কয়েকজন প্রফেসরের কথা আমার মনে পড়ছে। প্রফেসর রেহমান সোবহান, আব্দুর রাজ্জাক, আবু মুহম্মদ হবীবুল্লাহ, খান সরওয়ার মোরশেদ প্রমুখ। রেহমান সোবহান ছিলেন টু ইকনমির প্রবক্তা। একটা দেশে দুটো ইকনমি কি করে চলে তা বোঝা বেশ মুশকিল হতো। আসলে তারা টু ইকনমি চায়নি। টু কান্ট্রিই চেয়েছে। এই রেহমান সোবহানদের সাথে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগও ছিল মধুর। শোনা যায় ফোর্ড ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তারা সে সময় বহু অর্থ বানিয়েছে *(তথ্যসূত্র মাসিক সফর, জানুয়ারী ২০০০)।*

আজকাল রাজনৈতিক অঙ্গনে দু'টি বাক্য বহুল প্রচলিত। একটি হলো 'স্বাধীনতা বিরোধী' অন্যটি হলো 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের' ভিত্তিতে দেশ বিভাগ। এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের কেউ বিরোধিতা করলেই তারস্বরে চিৎকার করে স্বাধীনতা বিরোধী বলে আখ্যায়িত করে। আর এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সভা-সমিতিতে দুঃখ করে বলে থাকেন, "দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ ভুল ছিল।" এ দু'টি বাক্য বলা যেন তাদের এখন ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা হর হামেশা এ দু'টো বাক্য আওড়ান তারা হয়তো ইতিহাস পাঠ করেননি। আর পাঠ করলেও তা ভুলে গেছেন। আর ভুলে না গেলেও ভুলে যাবার ভান করছেন। কবি রঙ্গলাল একটি কবিতায় লিখেছেন-

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃংখল বল কে পরিতে চায় হে
কে পরিবে হায়?"

এ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে দু'টি ধারা প্রবহমান। প্রথম ধারা মনে করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যেহেতু ভারত আমাদেরকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা

www.pathagar.com

করেছে সেহেতু এরা আমাদের পরম বন্ধু। এদের সাথে বন্ধুত্বই আমাদের অর্জিত স্বাধীনতাকে সুসংহত ও সুদৃঢ় করতে পারে। দ্বিতীয় ধারা মনে করে ১৯৭১ সালে ভারত আমাদেরকে যে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে তা ছিল রাজনৈতিক, মানবিক নয়। কারণ ইতিহাসের শিক্ষা অনুযায়ী ব্রাহ্মণ্যবাদী, ইহুদী ও খ্রীষ্টান চক্র কোনদিনই মুসলমানদের বন্ধু নয়, চির শত্রু। আমাদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরআনেও এদের সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। কাজেই এই চিরশত্রুদের কাছে মুসলমানেরা কোন দিন নিরাপদ নয়। তাদের কাছে কল্যাণ আশা করতে পারে না। দুর্জনদের যেমন ছলের অভাব নেই, তেমনি এদেরও ছলের অভাব নেই। এ ছাড়া ভারতের গত পঁচিশ বছরের আচরণ বন্ধুত্বের ছিল না; ছিল প্রভুত্বের। কাজেই প্রভুদের দ্বারা গোলামদের স্বাধীনতা নিরাপদ ও সুসংহত হতে পারে না।

একটি দেশের স্বাধীনতা শুধু একটি পতাকা আর একটি জাতীয় সঙ্গীত নয়। দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা বলতে যা বুঝায় তা হলো (ক) ভৌগলিক স্বাধীনতা (খ) রাজনৈতিক স্বাধীনতা (গ) সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও (ঘ) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

ভৌগলিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা কতটুকু রয়েছে আমরা কমবেশী সবই জ্ঞাত। কাজেই উল্লেখিত তিনটি বিষয় আলোচনা করা অবান্তর। তবে এটুকু বলা যায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া সব স্বাধীনতাই অর্থহীন। কবি নজরুলের ভাষায়-

"ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ
চায় দু'টো ভাত একটু নুন,
বেলা বয়ে যায় খায়নিক বাছা
কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।"

কিন্তু এ দেশটিকে অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীল করতে যত প্রক্রিয়া রয়েছে তিনটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল গত ত্রিশ বছর যাবত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নামে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে তা গ্রহণ করেছে।

আজকে যারা কোকিলকণ্ঠে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগকে ভুল বলে আখ্যায়িত করছেন এরা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকেই অস্বীকার করেন। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হবার ফলেই এরা আজ প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, বিচারপতি, উকিল, অধ্যাপক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, বিমানের পাইলট, প্রকৌশলী, আমলা, ব্যবসায়ী, সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, অভিনেতা, শিল্পী প্রভৃতি হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। নিজেদেরকে বুদ্ধিজীবীর তালিকায় জাহির করতে পারছেন। আর যদি এক জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে এ দেশ বৃহৎ ভারতের সাথে বিলীন হয়ে যেতো তাহলে পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের মতো দুর্ভাগ্য তাদের কপালেও জুটতো। আবদুল-কালু নামে বাবুদের চাকর-বাকর অথবা বর্গাচাষী হয়ে বেঁচে থাকতে হতো। হয়তো কারো কারো বড় জোর রাইটার বিল্ডিংয়ের কেরানীর চাকুরীই ভাগ্যে জুটতো। কিন্তু কখনোই সমাজের বা রাষ্ট্রের উঁচু স্তরে অবস্থান করে পায়রার মতো বাক-বাকুম করতে পারতেন না। এর প্রমাণ বৃহৎ ভারতে হিন্দুভাষী কয়েকজন মুসলমানকে রাষ্ট্রের উঁচু পদে দেখা গেলেও বাংলাভাষী মুসলমানদের কোন অস্তিত্ব নেই।

www.pathagar.com

এখানে এক জাতি তত্ত্বের প্রবক্তাদের উদ্দেশ্যে মরহুম অধ্যাপক আবদুল হাই 'আমরা এবং ওরা' নামক একটি প্রবন্ধ লিখে হিন্দু মুসলিম কালচারের বৈপরীত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রবন্ধটা ছিল তাঁর প্রথম রচনা। তিনি প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন-তিনি যখন প্রথম চাকরীতে কৃষ্ণনগর কলেজে যোগ দেন, প্রবীণ হিন্দু অধ্যাপকেরা তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন, "এসব চাষার ব্যাটারা টাই ঝুলিয়ে কলেজে মাষ্টারী করতে এসেছে!"

সুতরাং দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছে বলেই চাষার বেটা থেকে সাহেবের বেটা হতে পেরেছে। ঘটিরা নিঃসম্বল অবস্থায় এ দেশে এসে গাড়ী-বাড়ীর মালিক হতে পেরেছে। বৃটিশ শাসিত একশত নব্বই বছরে ঢাকা শহরের পরিধি নওয়াবপুর রোড পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পূর্ববাংলা পূর্ব পাকিস্তান হয়েছিল বলেই তেইশ বছরের মধ্যে ঢাকা শহর শের-ই-বাংলা নগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ঢাকা মহানগরীতে পরিণত হয়েছে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পূর্বপাকিস্তান না হলে আজকের এই বাংলাদেশ অর্জন সম্ভব ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আজ আমাদেরকে ভারতীয় ইউনিয়নে থাকতে হতো। স্বাধীনতাকামী তৌহিদী জনতা পাকিস্তানের কাছ থেকে যত সহজে দেশকে স্বাধীন করতে পেরেছে ব্রাহ্মাণ্যবাদী ভারতের কাছ থেকে দেশকে স্বাধীন করা ততটা সহজ হতো না। আজকের কাশ্মীর তার জ্বলন্ত প্রমাণ। কাশ্মীরের পাশে সাহায্য করার মত মুসলিম দেশ রয়েছে। কিন্তু ভারতের কাছ থেকে স্বাধীন হওয়ার জন্য সহযোগিতা পাওয়ার মত কোন মুসলিম সহযোগী দেশ আমাদের প্রতিবেশী নেই।

১৯৪৭ সালে এ দেশের প্রায় ৯৬ ভাগ জনগণের সমর্থনে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছিল। আমরা জনসংখ্যায় অধিক হয়েও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণের শিকার হয়েছিলাম। কিন্তু এর জন্য যেমন দায়ী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী; তেমনি দায়ী ছিল এ দেশের নেতারাও। অবিভক্ত বাংলার শাসন ক্ষমতায় থেকেও শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দীন এই পূর্ব বাংলার হতভাগ্য জনগণের অর্থনৈতিক ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কিছু করেননি। কিছু চটকদার কথা এবং কিছু দান খয়রাত করে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন মাত্র।

অবিভক্ত বাংলার দু'দুবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শেরে বাংলা। অত্যন্ত দাপটের সাথে প্রধানমন্ত্রীত্ব করেছেন। ইংরেজ প্রশাসনে কি রূপ দাপটের সাথে প্রধানমন্ত্রীত্ব করেছেন একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তা স্পষ্ট হবে। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক একবার এক ইংরেজ সেক্রেটারীকে বলেছিলেন,"আমি জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত নেতা, আর তুমি বেতনভোগী সরকারী চাকুরে। আমার তত্ত্বাবধানে তুমি চলবে, তোমার তত্ত্বাবধানে আমার চলার প্রশ্নই ওঠে না।"

অথচ এ দাপট এ দেশের হতভাগ্য জনগণের ভাগ্য ফিরাতে ব্যবহার হয়নি। যদি হতো তাহলে এ দেশে অন্ততঃ একটি শিল্প কারখানাও গড়ে উঠতো। ইচ্ছে

www.pathagar.com

করলে তার দাপট দিয়ে এই পূর্ব বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক চেহারা কিছুটা হলেও পরিবর্তনে সক্ষম হতেন। এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান তিনি সহজেই রাখতে পারতেন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় ৫৪,৫০১ বর্গ মাইলের পূর্ববঙ্গে তখন লোকসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষ। আর এ জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশই ছিল আধা-সর্বহারা বা সর্বহারা। অবশিষ্ট ২০ শতাংশের সবই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়। আর অধিকাংশ জমিদারও ছিল হিন্দু। ধনশালী আর সম্পদশালী ছিল তারাই। তাদের অর্জিত সম্পদের বৃহৎ অংশই বিনিয়োগ করেছিল কলিকাতা ও হুগলী ভিত্তিক। দেশ বিভাগের পর তারা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে যাবার ফলে তাদের পুঁজি সঞ্চিত অর্থসহ মূল্যবান সামগ্রী সবই ভারতে চলে যায়।

ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রকে হিন্দু জনসাধারণ প্রথম থেকেই আপন বলে মনে করতে পারেনি। ফলে দেশ বিভাগের সাথে সাথে হিন্দুরা ব্যাপকহারে দেশ ত্যাগ করে চলে যায়। হিন্দু সরকারী কর্মচারী প্রায় সকলেই অপশনের ব্যবস্থা অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গে চলে যায়। ঐ পর্যায়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের হাতে মূলতঃ তেমন কোন মূলধন ছিল না। এমনকি এ অঞ্চলের একমাত্র অর্থকরী ফসল পাট ব্যবসাটিও মূলতঃ হিন্দু মাড়ওয়ারীদের হাতেই ছিল। তারা আবার মুনাফার টাকাটা ভারতেই বিনিয়োগ বা স্থানান্তরিত করত।

পূর্ববঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা। তাই কয়েক হাজার সম্পদশালী হিন্দু পরিবার পূর্ববঙ্গ থেকে চলে যাওয়ার ফলে শুধু যে পূর্ববঙ্গের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছিল তা নয়, এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও মারাত্মকভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। অন্যদিকে বিপর্যস্ত অর্থনীতির পাশাপাশি ভারত থেকে আসতে থাকে কপর্দকহীন লক্ষ লক্ষ নিঃস্ব বাস্তু ত্যাগী মানুষের দল যার সংখ্যা সরকারী হিসাবেই সাত লক্ষ ছিল।

দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গের ভাগে চাষযোগ্য জমি পড়েছিল সর্বমোট দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ একরের মত। যার মধ্যে ঐ সময়কালে এক কোটি আশি লক্ষ একরের মত চাষ করা সম্ভব ছিল। আর এর মধ্যে আঠার লক্ষ একরের মত পাট চাষযোগ্য জমি ছিল। অর্থকরী ফসল বলতে ছিল একমাত্র পাট। কিন্তু সমগ্র বাংলার ৬৮,২৫৮টি তাঁত সম্বলিত ১১৩টি পাটকলের মধ্যে একটি পাটকলও পূর্ববঙ্গের মাটিতে ছিল না। এর ফলে খাদ্যশস্য যা উৎপন্ন হতো তা আবার এই প্রদেশের জনসংখ্যার তুলনায় ছিল কম। তাই খাদ্য ঘাটতি সমস্যা ছিল প্রকট।

শিক্ষার দিক থেকে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা পিছিয়ে ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। তাই চাকুরীর ক্ষেত্রেও এখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ই অগ্রগামী ছিল। এদের মধ্যকার সক্ষম অংশও তখন ভারতে চলে যায়। এ প্রসঙ্গে একটিমাত্র উল্লেখ থেকেই তখনকার পূর্ববঙ্গের বাকি অবস্থাটা বুঝতে পারা যাবে, তাহলো এই যে সে সময় সুপিরিয়র সিভিল সার্ভিসের মধ্যে মাত্র একজন এখানকার মুসলমান কর্মচারী ছিলেন। এর ফলে

www.pathagar.com

যে প্রশাসনযন্ত্র পূর্ববঙ্গের জনগণের উপর চেপে বসে তা পূরণ করতে হয় পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের লোক ও বাস্তুত্যাগীদের মধ্য থেকেই। খনিজ সম্পদ বলতে পূর্ববঙ্গ কিছুই পায়নি। তবে এখানে মৎস্য সম্পদ ছিল। আর ছিল দু'লক্ষ তাঁত।

বন সম্পদ যা পাওয়া গিয়েছিল তা রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছেন-"ঐ সময়ের (বিভাগ পূর্ব) সমস্ত বাঙ্গালার ৬,৫৮,০৩৩ টাকা সরকারী রাজস্ব আয়ের বনাঞ্চলের মধ্যে যে অংশ পূর্ববঙ্গের ভাগে পড়ে তার সরকারী রাজস্বের পরিমাণ ছিল মাত্র ২,০০,০০০ টাকার কিছু উপরে। আর পশ্চিম বঙ্গ পেয়েছিলো ৪,৫০,০০০ টাকা রাজস্ব আয়ের বনাঞ্চল। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের ভাগে বন সম্পদ পড়েছিল রাজস্ব আদায়ের অনুপাতে সমগ্র বাংলার বন সম্পদের ১৩ ভাগের ৪ ভাগ মাত্র। পূর্ববঙ্গের স্থলপথ ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। তেমন উল্লেখযোগ্য পরিমাপের পাকা রাস্তা এখানে ছিলো না। তবে রেলপথ উন্নত ছিল। তখন রেলপথ পাওয়া গিয়েছিলো ১,৬১৯ মাইল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যা পাওয়া গিয়েছিল তার অবস্থা প্রায় ভগ্ন দশায় এসে দাঁড়িয়েছিল। বৃটিশ ভারতের শতকরা ২০ ভাগ লোকের বাস ছিল উভয় বাংলায়। সমগ্র ভারতের ৩৩ শতাংশ শিল্প ছিল পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায়। কিন্তু দেশ বিভাগের সময় পূর্ব বাংলার ভাগে পড়েছিল ৩০.৩ শতাংশ। এ ছাড়া বৃটিশ ভারতের সমগ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মাত্র ৩ শতাংশ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পড়েছিল সমগ্র পাকিস্তানের ভাগে। রাজেন্দ্র প্রসাদ, 'ইন্ডিয়া ডিভাইডেড' বইয়ের ২৯৫-২৯৬ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা হলঃ পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু (অর্থাৎ তদানিন্তন পাকিস্তান) অংশে বৃটিশ ভারতের ২৬৭ শতাংশ লোকের বাস ছিল; কিন্তু এসকল অঞ্চলে সম্মিলিতভাবে শিল্পের অবস্থান ছিল বৃটিশ ভারতের মাত্র ১৩.৯ শতাংশ। আর বৃটিশ ভারতের শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র ৭.৩৬ শতাংশ শ্রমিক এ সকল অঞ্চলের (অর্থাৎ তদানিন্তন সমগ্র পাকিস্তান) শিল্পে নিযুক্ত ছিল।

আদতে শিল্পের দিক থেকে পূর্ববঙ্গ পরিপূর্ণভাবেই অবহেলিত ছিল। এমনকি প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ এ.কে. ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং খাজা নাজিমুদ্দীনও এ ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অবদানের অধিকারী হতে পারেননি।

পূর্ববঙ্গে কি কি শিল্প তখন ছিল না বা পশ্চিমবঙ্গে কি কি শিল্প পড়ল তা বলে বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। শুধু পূর্ববঙ্গ তখন শিল্প বলে যা পেয়েছিল তা-ই এখানে উল্লেখ করছি। আর তা হলোঃ ১। ৫০,০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি মাত্র সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ছাতকে। ২। ৭টি কাপড়ের কল ২,৬০০ লুম ও ১,১২,০০০ স্পিন্ডল সম্বলিত। ৩। ৫টি চিনির কল। ৪। ৩৫ থেকে ৪০টির মত জুট বেলিং প্রেস। ৫। ৬০/৬৫টি ধান ভাঙ্গান কল। ৬। ছোট ছোট কয়েকটি ছাপাখানা। ৭। ছোট-খাট কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ ও ডক। ৮। মাত্র ৭,৭০০ একরের চা বাগান। ৯। সৈয়দপুর ও পাহাড়তলীতে শুধু মেরামতযোগ্য দু'টি রেলওয়ে ওয়ার্কশপ। ১০। ছোট ছোট ৪টি ম্যাচ (দিয়াশলাই) কারখানা।

www.pathagar.com

এর বাইরে উল্লেখ করার মত আর কোন শিল্প পূর্ববঙ্গের ভাগে পড়েনি। পূর্ববঙ্গ আর যা পেয়েছিল তা হলোঃ

(ক) মাত্র ৭,২৮৬ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। (খ) নদীপথে চলাচলের জন্য যাত্রীবাহী কিছু জাহাজ ও লঞ্চ ছিল। (গ) নদীপথে মাল চলাচলের জন্য বার্জ, ফ্লাট, ষ্টিমার ও টাগ প্রভৃতি ছিল। (ঘ) সে সময়কালে বছরে মাত্র ৫ লক্ষ টনের মত মাল হ্যান্ডলিং করার ক্ষমতাসম্পন্ন চট্টগ্রাম বন্দর। (ঙ) ঢাকায় একটি ছোট বিমান ঘাঁটি ছিল। এ প্রসঙ্গে আর উল্লেখ করার মত কিছু পূর্ববঙ্গ পায়নি।

দেশ বিভাগের সময় কলিকাতা ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে পূর্ব বাংলাকে তেত্রিশ কোটি টাকা দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় পার্টিশন কাউন্সিলের একচোখা নীতির ফলে কলিকাতার দালান, কোঠা, ইমারত, স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি মার্কেট ভ্যালুর পরিবর্তে বুক ভ্যালু অনুসারে মূল্যায়ন করায় তেত্রিশ কোটি টাকার পরিবর্তে নয় কোটি টাকা পাওনা হয়। পরবর্তীতে মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকারের হিসাবে ভারত ও পশ্চিম বাংলার কাছে পূর্ব বাংলার পাওনা হয় মোট তিন কোটি টাকা। আর পূর্ব বাংলার কাছে ভারত ও পশ্চিম বাংলার পাওনা হয় নয় কোটি টাকা। অর্থাৎ ৬ কোটি টাকা পূর্ব বাংলা দেনা হয়। অতঃপর বিনা ক্ষতিপূরণে কলিকাতা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের হাতছাড়া হয়েছিল। সে জন্য নেতারা তখন আন্দোলনে নামে নি। বিক্ষোভ প্রদর্শন করেননি। অথচ তৎকালীন নীলক্ষেত ব্যারাক নামক সরকারী আবাসিক ছাউনিতে পানি সংকটের ইস্যু নিয়ে বদনা, লোটাসহ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও কর্মসূচী ঠিকই পালিত হয়েছিল। এই রেলপথগুলো খুব বেশী ব্যবহারের ফলে ইঞ্জিন ও গাড়ী ছিল চলাচলের অনুপযোগী। আমাদের দেশের নেতা-নেত্রীরা অন্য দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে অর্থনীতিকে যেভাবে গলা টিপে হত্যা করার ঘৃণ্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত তা নজিরবিহীন। পৃথিবীর অন্যান্য নেতা-নেত্রীরা আমাদের দেশের নেতা-নেত্রীদের ন্যায় দেশকে সর্বক্ষেত্রে পরনির্ভরশীল করার এরূপ দৃষ্টান্ত আছে কিনা আমার জানা নেই। আপনাদের জানা আছে কিনা জানি না। স্বাধীনতার নামে, গণতন্ত্রের নামে, অমুক-তমুকের স্বপ্ন বাস্তবায়নের নামে নেতা-নেত্রীরা কিভাবে দেশের অর্থনীতিকে গলা টিপে হত্যা করার জঘন্য তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে জাতি আজ অসহায়ভাবে তা প্রত্যক্ষ করছে।

সোনালী আঁশ পাট থেকেই শুরু করা যাক। বৃটিশ ভারত এবং পাকিস্তান আমলে এই পূর্ব বাংলার জনগণের প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল পাট। এই পাট নিয়ে অনেক কিংবদন্তী রয়েছে এদেশের জনগণের মুখে মুখে। কিন্তু এ পাট এদেশের জনগণের ভাগ্য ফিরাতে না পারলেও কলিকাতার বাবুদের ভাগ্য ফিরিয়েছে।

পাট উৎপাদনকারী দেশের নগরী ঢাকাকে বঞ্চিত করে কলিকাতাকে গড়ে তোলা হয়েছে। আগেই উল্লেখ করেছি বিভাগপূর্ব ভারতের সমগ্র বাংলায় ৬৮,২৫৮টি তাঁত সম্বলিত ১১৩টি পাটকলের মধ্যে একটি পাটকলও পূর্ববঙ্গের মাটিতে ছিল না। অথচ শুধুমাত্র কলিকাতায়ই ৪২টি জুট মিলস স্থাপন করা হয়েছিল। এসব

www.pathagar.com

মিলে পাট সরবরাহ হতো পূর্ববঙ্গ থেকে। পাট ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিলো নারায়ণগঞ্জ। এখানে ফড়িয়াদের কাছ থেকে পাট ক্রয় করে নিতো মাড়োয়ারীরা। কিন্তু এই মাড়োয়ারীরা কিরূপ শোষণ করতো সে শোষণের ইতিহাস বর্তমান বংশধরেরা জানতে পারছে না। জানতে দেয়া হচ্ছে না। পাকিস্তান আমলে শেখ সাহেব গর্ব করে বলতেন- এক বছরের পাট বিক্রি করে তিন বছরের চাল ক্রয় করবেন। অথচ স্বাধীনতার পর এই পাট কৃষকের গলার ফাঁসে পরিণত হয়।

বৃটিশ ভারতে ইংরেজ ও হিন্দুরা এই পূর্ব বাংলার জনগণকে একশত নব্বই বছর হয় চাষায়, নয়তো কুলি মজুরে পরিণত করেছিল। পুঁজি বলতে কিছুই ছিলো না এ দেশে। তৎকালে পুঁজি যাঁদের হাতে ছিলো তারা সবাই ছিলেন হিন্দু অথবা অবাঙ্গালী। পুঁজিপতি হিন্দুরা এ দেশে যা ছিল দেশ বিভাগের পর এ দেশ থেকে চলে যাবার ফলে মুসলমান বাংলাদেশীদের মধ্যে একজন পুঁজিপতিও ছিলো না। আগাখানী সম্প্রদায়কে আগা খান নিজে এ অঞ্চলে টাকা খাটাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এরা অনেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিকূল আবহাওয়ায় হতাশ হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন করাচীতে। সে সময়ে প্রথম প্রথম যে কয়টি জুট মিল স্থাপিত হয় তার মধ্যে আদমজী মিল এবং ইস্পাহানী মিল প্রধান। এঁরা কোলকাতা অঞ্চল থেকে পুঁজি এবং তাঁদের শ্রমিক নিয়ে ঢাকায় আসেন। কারণ এখানে চাষ-বাসের লোক ছাড়া দক্ষ শ্রমিক বলতে কিছুই ছিলো না। দেশের বাইরে থেকে যে সমস্ত শ্রমিক আনা হয়েছিল তারা সবই ছিলো বিহারী। কারণ তা না হলে কলকারখানা স্থাপন করা যেতো না। বলাবাহুল্য হঠাৎ করে একদল শ্রমিককে বসিয়ে দিলেই কারখানা চালু করা যায় না। ৫৪ সালে এ মিলে ভয়াবহ বাঙ্গালী-বিহারী দাঙ্গায় কয়েক শ' জন নিহত হয়। তেমনি দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়েছিলো সদ্য প্রতিষ্ঠিত কর্ণফুলী পেপার মিলে। অনেকের মতে এর পেছনে ছিলো রাজনৈতিক উস্কানী। দেশ শিল্পায়িত হোক বা না হোক সেটা যেন তাদের কাছে ছিল একেবারেই গৌণ। আদমজী ও কর্ণফুলি পেপার মিলে দাঙ্গা বাধিয়ে এদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করার যে প্রয়াস শুরু হয়েছিলো '৭২ পরবর্তী বাংলাদেশে সে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন সফল হয় এবং বাংলাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ বিলুপ্ত হয়ে সমগ্র দেশ ভারতীয় পণ্যের বাজার হয়ে ওঠে।

পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা এদেশকে শোষণ করেছিলো একথা যেমন সত্য, তেমনি এ দেশকে শিল্পায়ন করতে তাদের অবদানের কথা অস্বীকার করা যায় না। শোষণ যা হয়েছে এর সহায়ক শক্তি হিসেবে এদেশের নেতারাও ছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ৭৮টি পাটকল ছিল। বৃটিশ আমলে বস্ত্রকল ছিলো ৪টি। পাকিস্তান আমলে হয় ৬২টি। চিনিকল ছিলো ২টি। পাকিস্তানে ২৩ বছরে হয় ১৪টি। এর অধিকাংশ মিলের মালিক ছিল বাঙ্গালি। অথচ ১৯৪৭ সালের আগে পাটকল স্থাপন করার মতো একজন বাঙ্গালি পুঁজিপতিও এদেশে ছিল না। বৃটিশ আমলে নবাব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরী ইংরেজদের সাথে অনেক দেন-দরবার করে ঢাকায় মাত্র ১টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। আর পাকিস্তানের ২৩ বছরে বিভিন্ন বিষয়ে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। আজকে

www.pathagar.com

বিদেশীদের কাছে গ্যাস বিক্রি করার জন্য ক্ষমতাসীনরা প্রতিযোগিতায় নেমেছে। অথচ এই গ্যাস আহরণের চেষ্টা পাকিস্তান আমলে শুরু হয়েছে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের মাঝামাঝি সময়ে তা সফল হয়েছে। আজকে অনেকেই অধিক পরিমাণে খাদ্য উৎপাদনের কৃতিত্ব দাবী করেন। অথচ আমরা জানি অর্থনৈতিক সফলতা রাতারাতি আসে না। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা ও যোগ্য নেতৃত্বের দিক নির্দেশনা। ষাট দশকের শেষের দিকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার উদ্দেশ্যে এদেশে প্রথম অধিক ফলনশীল ইরি ধান চাষের পরিকল্পনা নেয়া হয়। এরই ফলশ্রুতিতে পর্যায়ক্রমে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে শোষণ যা হয়েছে এর বিপরীতে সন্ধানীদের কলম দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানে কাগজে সিল মারার জন্য নিয়ে যাবার মতো অপপ্রচারই বেশী হয়েছে। এখানে বহু ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা উল্লেখ করলেই তা স্পষ্ট হবে।

১৯৫৬ সালে একজন প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতার ভার্সিটির একজন শিক্ষকের সাথে সাক্ষাত হয়। সাক্ষাতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শিক্ষক মহোদয় তাঁর একটি গ্রন্থে লিখেন, "স্যার দেখেছেন, এলফিন্টস্টোন রোডের সমস্ত চাকচিক্যের মূলে রয়েছে পূর্ববঙ্গের পাট।" আমি বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলাম এ নতুন তথ্য তিনি আবিষ্কার করলেন কোথায়? এ রাস্তাটির বয়সও যেমন কমপক্ষে পঞ্চাশ-ষাট বছর তেমনি দোকানগুলিও প্রায় বৃটিশ আমলের।

১৯৭০ সালের নির্বাচনী জনসভায় আমরা নেতাদের মুখে শুনেছি এক বছরের পাট বিক্রি করে দশ বছরের চাল কিনবেন। কিন্তু দেশ স্বাধীনতার পর মাত্র তিন বছর পর শোনা গেল নেতাদের মুখে উল্টো কথা। এ সম্পর্কে ১৯৭৩ সালের ২৯ আগষ্ট দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত তৎকালীন অর্থ ও পাট বিষয়ক মন্ত্রী মরহুম তাজউদ্দিন আহমদ-এর উদ্ধৃতি লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন- "পাকিস্তান আমলে যখন এদেশ থেকে সরকারীভাবে ভারতে পাট রপ্তানী হত না তখনো কলকাতার পাটকলগুলো পাটের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়নি। কারণ পাকিস্তান আমলে চোরাপথে এদেশের পাট ভারতে যেত।" তিনি বলেন,"এতকাল আপনারা জানতেন, বিশ্বে পাট উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্থানই ছিল প্রথম। কিন্তু এখন আপনাদের সে ধারণা বদলাতে হবে। বর্তমানে ভারতই বিশ্বে পাট উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে প্রথম। কারণ এ বছর ভারতে মোট ৭৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে এ বছর মোট পাট উৎপাদন বড় জোর ৫৫ লক্ষ বেল বা আরো কম।" (দৈনিক ইত্তেফাক, সম্পাদকীয়, আগষ্ট-২৯, ১৯৭৩)

১৯৭১-৭২ ভারত বিচিত্রা লিখেছিলো- "পূর্ব পাকিস্তান দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু মানের পাট উৎপাদনকারী দেশ। ভারতের এই সুনাম কোন দিনই ছিলো না। পাকিস্তান আমলে ভারত নিজের পাটকলগুলোকেই প্রয়োজনীয় কাঁচাপাট সরবরাহ করতে পারতো না। বিদেশে লক্ষ লক্ষ বেল পাট রফতানি তো দূরের কথা।" এর এক বছর পর হঠাৎ করে ভারতের পাটের উৎপাদন রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। এ সম্পর্কে ১৯৭৩ সালের ৭ই ডিসেম্বর ভারতের তৎকালীন বাণিজ্য উপমন্ত্রী সি, এ, জজ লোকসভায় ঘোষণা করেছিলেন- "ভারতের পাটের উৎপাদন অতীতের সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে।"

www.pathagar.com

১৯৭৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশনের প্রকাশিত ভারত বিচিত্রা'য় লেখা হয়েছে-

"ভারতীয় অর্থনীতিতে তার পাট ভারতের প্রধানতম বিদেশী মুদ্রা অর্জনকারী পণ্যদ্রব্য। একমাত্র ১৯৭১-৭৩ সালে পাট ২৬৫ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা আয় করেছে। এই অংক হচ্ছে ভারতের সর্বমোট বিদেশী মুদ্রা আয়ের ১/৬ ভাগ।" (ভারত বিচিত্রা ১৫-৯-১৯৭৩)।

অন্যদিকে বাংলাদেশের পাটকলগুলো একটার পর একটা আগুনে তখন পুড়ছিল। বাংলাদেশের তৎকালীন পাটমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে ৭২-৭৩ সালের এক বছরে পাটকলগুলোতে ২৫ কোটি টাকা লোকশানের হিসাব জাতিকে জানিয়েছিলেন। আর গত ২৫ বছরে তিনটি সরকারের আমলে প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকা পাট কলগুলো লোকসান দিয়ে আসছে।

১৯৭০ সালে এদেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিলো আট আনা সের চাউল ও ছয় আনা সের গম খাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়ার জন্য। এটাই ছিলো জনগণের প্রকৃত ম্যান্ডেট। ছয় দফা জনগণ তো দূরের কথা অধিকাংশ আওয়ামী প্রার্থীও জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে নাই। অথচ নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ের পর ৬ দফা হয় জনগণের ম্যান্ডেট। আর আট আনা সের চাউল ও ছয় আনা সের গম খাওয়ার প্রতিশ্রুতি ভেস্তে যায়।

পাকিস্তানীরা শোষণ করেছে এর সাথে আমার দ্বিমত নেই। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতীয়রা এক বছরে যে শোষণ আমাদেরকে করেছে পাকিস্তানীরা ২৩ বছরেও তা করতে পারেনি। একটি উদাহরণ দিলে জাতির কাছে স্পষ্টভাবে তা প্রতিভাত হবে।

গত কয়েক বছরে সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় বাংলাদেশ ভারতে ১৫০ থেকে ২০০ কোটি টাকার দ্রব্যাদি রফতানী করে। আর ভারত রফতানী করেছে ৩,৫০০ থেকে প্রায় ৪,৫০০ কোটি টাকার দ্রব্যাদি। এটা শুধু বৈধ পথে। অবৈধ পথের কোন হিসাব নেই। অর্থাৎ ভারতের ১০০ কোটি লোক বাংলাদেশের ১২ কোটি লোকের কাছে ৪,৫০০ কোটি টাকার পণ্য বিক্রি করছে। আর ১২ কোটি লোক ১০০ কোটি লোকের কাছে বছরে মাত্র ১৫০ থেকে ২০০ কোটি টাকার পণ্য বিক্রি করছে। এরপরও আমরা বেঁচে আছি আল্লাহর অপার করুণায়।

পাকিস্তানী শোষণের বিরুদ্ধে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট একটি গান বেঁধেছিল। গানটি হলো -

"ষোল টাকা সের লবণ কিনা
পঁচিশ টাকা চায়
লীগ লীগ করিয়া মর্দ
পাগল হয়া যায়।
মরি হায়রে হায় দুঃখ বলি কারে
জালেম লীগ সরকারের।

www.pathagar.com

এখন যদি শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানী বেঁচে থাকতেন এবং সীমাহীন শোষণের এই নগ্ন মহড়া অবলোকন করতেন তারা নতুন করে কি গান বাঁধতেন জানি না।

এই দেশটা কোন দল বা ব্যক্তির নয়, জনগণের। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি সবই জনগণের জন্য। অতএব, সকল দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জনগণের সেবা, কল্যাণ আর সুখ সমৃদ্ধির জন্যই হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। বাংলাদেশের সরকারী দল এবং বিদেশী দালাল হিসাবে চিহ্নিত বিরোধীদলসমূহের কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ জনগণের প্রশ্ন হচ্ছে, ১৩ কোটি মানুষের চাহিদা আর সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে ময়দানে আর জাতীয় সংসদের অভ্যন্তরে জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন যে সকল ইস্যুকে ঘিরে প্রায় দু'যুগ ধরে রাজনীতির হৈচৈ শোনা যাচ্ছে, দেশকে নৈরাজ্যের নরকে পরিণত করতে এই তামাশার নাটক আর কতকাল চলবে?

গণতান্ত্রিক প্রহসনঃ স্বাধীনতার পর মূল লক্ষ্য ছিল দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এই আন্দোলনে যারা জীবন কোরবানী দিয়েছে, তারাও চেয়েছিল, "গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক"। অথচ গণঅভ্যুত্থানে সাফল্যের ফসল ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা হয়েছে।

রাজাকার আর স্বাধীনতাপক্ষ প্রসঙ্গঃ কোন পাগলও বিশ্বাস করবে না এই দেশকে কখনও কোনভাবে পাকিস্তান বানানো সম্ভব। আর এই দেশ পাকিস্তানের দ্বারা কোন দিক দিয়েই হুমকির সম্মুখীন হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। অথচ একটা ছাগলের মত ঘিলু যার মাথায় আছে সেও বুঝতে পারে এই দেশ ভারতের দ্বারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, এমনকি ভৌগোলিকভাবেও হুমকির সম্মুখীন। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি? জনগণের ঈমান, আকিদার সঙ্গে সঙ্গতি সম্পন্ন কোন আদর্শের কথা, কোন ন্যায়সঙ্গত অভিমত তুললেই এক শ্রেণীর গলাবাজদের কণ্ঠ দিয়ে রেকর্ড বাজতে থাকেঃ রাজাকার, পাকিস্তানের দালাল, স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি-আরো কত কি?

এদেশে পাকিস্তানী খেলোয়াড় এলে বলা হয়, পাকিস্তান হয়ে গেল, কিন্তু ৩০ লাখ মানুষ হত্যার নীলনকশাকারী ভুট্টোকে যখন রক্তের দাগ না শুকাতেই এদেশের মাটিতে শেখ মুজিবর রহমান সংবর্ধনা দিয়েছিলে, তখন বলা হয়নি এটা পাকিস্তান হয়ে গেল। বেনজীর ভুট্টোর দূত যখন আওয়ামী নেত্রীর সাথে চুপে চুপে কথা বলেছিলেন, তখন এটা পাকিস্তান হয়নি। রাজীব গান্ধীর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে ভুট্টোতনয়ার সাথে গলায় গলায় সুর মিলিয়ে কান্না জুড়েছেন তখন পাকিস্তান হয়ে যায়নি। বিরোধী দলীয় সার্ক সম্মেলনে পাকিস্তানে গিয়ে শেখ হাসিনা যখন গণহত্যাকারী টিক্কা খানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, তখন পাকিস্তান হয়ে যায়নি।

যাদের দ্বারা স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন নয় তারাই আজ স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি। যাদের বয়স এখন ৩০ বছর হয়নি অর্থাৎ যারা মুক্তিযুদ্ধের পরে জন্মগ্রহণ করেছে, ইসলামের আদর্শের কথা বললে তারাই রাজাকার। কিন্তু আজকের বাস্তবতার

www.pathagar.com

প্রেক্ষাপটে যে দেশ আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রধান হুমকি তাদের দালালীতে নিয়োজিত চক্রান্তকারীরা স্বাধীনতা পক্ষের শক্তি। কিন্তু জনগণ জানে এই দেশের সীমানা উঠিয়ে দিতে পারলে কারা রাতারাতি পায়জামা লুঙ্গি ছেড়ে ধুতি পরতে পারবে, কারা 'জয়বাংলা' বাদ দিয়ে 'জয়হিন্দ' বলতে পারবে, কারা 'বন্দে মাতরম' আর উলু ধ্বনিকে সংস্কৃতির আশীর্বাদ মনে করে নিজেদের ধন্য মনে করতে শুরু করবে। পক্ষান্তরে যাদের স্বাধীনতা বিরোধী আর রাজাকার বলা হয় তারা জীবন গেলেও 'আলাহু আকবর' ছেড়ে 'জয়হিন্দ' বলতে পারবে না। আর স্বাধীনতার সঙ্গে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দানকারীদের অস্তিত্বের প্রশ্নটিও কত গভীরভাবে জড়িত তারও ব্যাখ্যা দান নিস্প্রয়োজন। অতএব জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে স্বাধীনতা পক্ষ কারা আর কাদের দ্বারা স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন।

উপসংহার

আত্মকেন্দ্রিক আমাদের এই সমাজে কল্যাণমূলক কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কুড়াতে হয় সুনামের বদলে দুর্নাম। প্রতিহিংসার মুখোমুখি হতে হয় প্রতিনিয়ত। যেমন হয়েছিলেন জনাব মুহাম্মদ নূরউল্লাহ্। এই পুস্তকে সংযোজিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় দৈনিকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ, উপ-সম্পাদকীয় কলাম এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তৎকালীন তাত্ত্বিক সাংবাদিকেরা তাঁর বক্তব্য বিবৃতির বিরুদ্ধে যেসব বিষয়ে বিষোদ্গার করেছেন গত ৩১ বছরের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তা অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি দেশ ও জাতির স্বার্থে যে সব গঠনমূলক বিবৃতি-বক্তব্য রেখেছেন তা গত ৩১ বছরের নব্য মীর জাফরদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অক্ষরে অক্ষরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

আমাদের বুঝতে হবে এদেশের নব্য উমি চাঁদ, জগৎশেঠদের সাথে বন্ধুত্ব করে যে সব মীরজাফরেরা দেশ ও জাতির কল্যাণ, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত ও সুসংহত করতে চান তারাই দেশ ও জাতির শত্রু। ইতিহাসে তা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। জনাব নূরউল্লাহ ৩১ বছর আগে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য ও কর্মকান্ডের মাধ্যমে জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা ও সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

শেখ সাহেব প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ্য করে সভা-সমাবেশে প্রায়ই গ্রাম-বাংলার একটি প্রবচন বলতেন। প্রবচনটি হলোঃ

" যারে দেখি নাই, সে না জানি কত সুন্দরী,
যার রাঁধা খাই নাই, সে না জানি কত রাঁধুনী।"

গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী আওয়ামী লীগ যে কত বড়ো গণতান্ত্রিক গত ৩১ বছরে এ দেশের জনগণ হাড়ে হাড়ে তা টের পেয়েছে। গণতন্ত্রের নামে যে অনৈক্যের বীজ

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ এদেশে রোপণ করেছে গত ৩১ বছরে ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে তা জাতির জন্য বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন চেতনার নামে বিভেদ সৃষ্টি করে জাতিকে পঙ্গু করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাধানতা ও গণতন্ত্রের নামে ১৯৪৭-এর পূর্বাবস্থায় জাতিকে নিয়ে গিয়ে গোলামীর জিঞ্জির পরিয়ে দেয়ার নানামুখী কৌশলগত চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে আজ সর্বক্ষেত্রে যে নৈরাজ্যকর অবস্থা বিরাজমান তা আওয়ামী লীগেরই সৃষ্ট। তাই দেশপ্রেমিক জনগণের প্রত্যাশা এই নৈরাজ্যের নরকে গণতন্ত্রের তামাশার নাটক বন্ধ হোক। বিভেদ ষড়যন্ত্র আর ভুল বোঝাবুঝির অবসানের মধ্য দিয়ে ফিরে আসুক গণতান্ত্রিক পরিবেশ আর মূল্যবোধ। শুভবুদ্ধির উদয় আর দেশপ্রেম জাগ্রত হোক সবার মনে। ব্যক্তি বিদ্বেষ আর দলীয় হানাহানির বদলে সুস্থ রাজনীতি চর্চা ও নিয়মতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা ফিরে আসুক। জাতীয় স্বার্থ আর জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে সবার মাঝে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হোক। দেশের মঙ্গল চাইলে এছাড়া কোন উপায় নেই।

বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। এদেশ আমাদের সকলের। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ খৃষ্টানসহ সকল সম্প্রদায়ের। জনাব নূরউল্লাহ ছাত্র-জীবন থেকেই বাংলাদেশের স্বার্থে বিভিন্ন ফোরামে আন্দোলন করেছেন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে ছিলো তার সক্রিয় পদচারণা। আমাদের দেশের তথাকথিত জনপ্রিয় (!) নেতারা তখন প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক হয়ে নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিয়ে দেশের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে সময় ও সুযোগমত একবার আইয়ুবপন্থী, আরেকবার সোহরাওয়ার্দীপন্থী হয়ে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেছেন। মার্ক টোয়েন বলেছেন- "সবার সংগে তাল মিলিয়ে যে কথা বলে, সে ব্যক্তিত্বহীন। "এই ব্যক্তিত্বহীন রাজনীতির বিরোধিতা আমি সহ আরো অনেকেরই। ব্যক্তিত্বহীন রাজনীতির পরিণামে অনেক কাফফারা এদেশের মানুষ গত ৩১ বছর দিয়ে যাচ্ছে। এদেশের মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য। পিন্ডির গোলামী থেকে দিল্লীর গোলামী করার জন্য নয়। অথচ গত ৩১ বছর আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে দিল্লীর গোলামী করার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বেঁধে ফেলার জন্য চেষ্টা চলছে।

আগেই বলেছি বাংলাদেশটা আমাদের সকলের। আজকে দেশে যে সব সমস্যা বিরাজমান, সে সব সমস্যা এদেশের সাধারণ লোকের সৃষ্ট সমস্যা নয়। ----আর এই সমস্যার সমাধান কোন একক দল বা নেতার পক্ষে সমাধান সম্ভব নয়। এ জন্য চাই সম্মিলিত প্রয়াস আন্তরিকতা ও অগাধ দেশপ্রেম।

জনাব নূরউল্লাহ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তাঁর আদর্শ ও বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর আদর্শ ও বিশ্বাস শুধু কথায় নয়; কর্মে-চিন্তায় প্রতিফলিত হয়েছে। এমনকি চারিদিকে যখন আদর্শ বিচ্যুতির সীমাহীন প্রতিযোগিতা চলছে তখনও তিনি নিজ আদর্শ ও বিশ্বাসে অবিচল ও অটল রয়েছেন। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ তাঁর লালিত কৃষ্টি ও কালচার। মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত তাঁর নীতি ও আদর্শের প্রতিফলন দৃশ্যমান।

www.pathagar.com

আমাদের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা যখন গড্ডালিকার প্রবাহে গা ভাসিয়ে আদর্শ-নীতি বিচ্যুত হয়ে অসত্য ও পেশী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন তিনি তখন নির্ভয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। শুধু তাই নয়; জাতীয় যে কোন দুর্যোগ মুহূর্তে একান্ত আপনজনদের মতো আত্মপীড়িত দুঃস্থ মানবতার সেবায় এগিয়ে এসেছেন। এদেশের অনেক তথাকথিত জনপ্রিয় নেতা সভা-সমাবেশে বলতেন, "আমি বাংলার মানুষকে ভালোবাসি, বাংলার মানুষ আমাকে ভালবাসে।" এই ভালোবাসার ঠেলায় এদেশের ক্ষুধার্ত লোক মরা মুরগী, নাড়ি-ভুড়ি এবং পরিত্যক্ত বমি খেয়েছে। তাদের সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা গিয়েছে। এমনকি ১৯৭০ সালে যখন দক্ষিণাঞ্চলের জলোচ্ছ্বাসে কয়েক লক্ষ বনি আদম মারা গিয়েছিলো তখন বিশ্ববিবেক কাঁদলেও তথাকথিত জনপ্রিয় নেতার বিবেক কাঁদেনি। বরং তাদেরকে কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহার করে কুৎসিত রাজনীতি করেছেন। লক্ষ লক্ষ বনি আদম যখন খোলা আকাশের নীচে কাপড়ের অভাবে শীতে কাঁপছিল তখন ঐ জনপ্রিয় নেতা কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে হরেক রকমের কাপড়ের গেইট সাজিয়ে নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছিলেন। এইসব ভন্ড নেতাদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক সচেতন মানুষের ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে জনাব নূরউল্লাহ'র দীর্ঘ রাজনৈতিক পথ পরিক্রমায়। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও স্বপ্ন ছিলো একটি বিভক্ত জাতি নয়; ঐক্যবদ্ধ জাতির। রাতারাতি ধনী হওয়ার অভিলাষে অর্থের পিছনে তিনি ছুটেননি। মুসলিম জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন সংগ্রামী পুরুষ। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক হানাহানি, ক্ষমতার মোহ, নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে তাঁর বিবেককে পীড়া দেয়। তাই মরহুম নূরুল আমিনের ভাষায় বলতে হয়-"যে জাতি নিজের ধ্বংস নিজে ডেকে আনে জনাব নূরউল্লাহ'র মতো সীমিত সংখ্যক নেতা কি-ই বা করতে পারে, অসহায়ভাবে ধ্বংসযজ্ঞ দেখা ছাড়া।"

আজকে যারা ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে দেশপ্রেমিক নেতাকর্মীদের চরিত্র হনন করছেন তাদের মুখোশ উন্মোচন হতে বোধ হয় আর দেরী নেই কারা দেশপ্রেমিক, কারা দেশদ্রোহী, কারা গণতন্ত্রের শত্রু, কারা গণতন্ত্রের দুশমন। কারা অর্থের বিনিময়ে অসৎ রাজনীতি করেছেন, কারা নির্মোহ থেকে দেশ ও জাতির কল্যাণ ও মঙ্গল চেয়েছেন। কারা প্রাসাদ ষড়যন্ত্র করেছেন, আর কারা এই মাটি ও মানুষের রাজনীতি করেছেন। কারা স্বাধীনতার শত্রু, আর কারা স্বাধীনতার বন্ধু।

ইতিহাস সঠিক রায় দেয়। তবে অনেক দেরীতে। ইতোমধ্যেই এর আলামত শুরু হয়ে গেছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন, "মুসলমানগণ! তোমাদিগকে জান ও মাল উভয় দিক দিয়াই পরীক্ষা করা হবে এবং তোমরা আহলি কিতাব ও মুশরিকদের নিকট হতে অসংখ্য কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। এই সব অবস্থায় তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করে ও খোদার ভয় রক্ষা করে চলতে পার তবে নিশ্চয়ই ইহা অত্যন্ত উঁচু দরের সাহসিকতার ব্যাপার (৩ঃ১৮৬)। জমীন ও আসমানের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ এবং তাঁর শক্তিই সর্বজয়ী সর্বগ্রাসী (৩ঃ ১৮৯)। মন-ভাঙ্গা হয়ো না,

www.pathagar.com

চিন্তা করো না। তোমরাই বিজয়ী থাকবে--যদি তোমরা ঈমানদার হও" (৩ঃ১৯৬।

সুতরাং পবিত্র কোরানের এই অমোঘ বাণীগুলো আমাদের হৃদয়ে মনে-প্রাণে ধারণ করতে হবে। কে শত্রু, কে মিত্র তা চিনতে ও জানতে হবে। চেচনিয়া, বসনিয়া, কাশ্মীর ও আলজেরিয়ার মুসলমানদের ন্যায় ঈমানী চেতনাকে শানিত করতে হবে। তাহলে পৃথিবীর কোন শক্তি নেই, আমাদের অস্তিত্বকে ধ্বংস করে।

যারা ২৬৪ বছরের ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিয়ে অথবা না পেয়ে বলে থাকে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা আমাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা এনে দেবে, তারা বোকার স্বর্গে বাস করে। এরাই স্বাধীনতার প্রকৃত শত্রু, মীরজাফরের প্রতিচ্ছবি। এরাই স্বীয় স্বার্থে সঠিক ইতিহাস আড়াল করে এ জাতিকে আবার পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়ে ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আর এই ইতিহাস বিকৃতিকে যদি আমরা নীরবে মেনে নেই তাহলে আমাদের কপালে আরো দুর্ভোগ অবধারিত। সচেতন জনগণ জাতির জন্য দুর্ভোগ সৃষ্টি হতে দিতে পারে না। প্রকৃত ইতিহাসের লালন ও পরিচর্যার দৃপ্ত শপথ নিতে হবে সবাইকে। এই হোক আমাদের সকলের প্রত্যাশা।

www.pathagar.com

পারিবারিক
ও
রাজনৈতিক জীবনের
কিছু খন্ডচিত্র

www.pathagar.com

www.pathagar.com

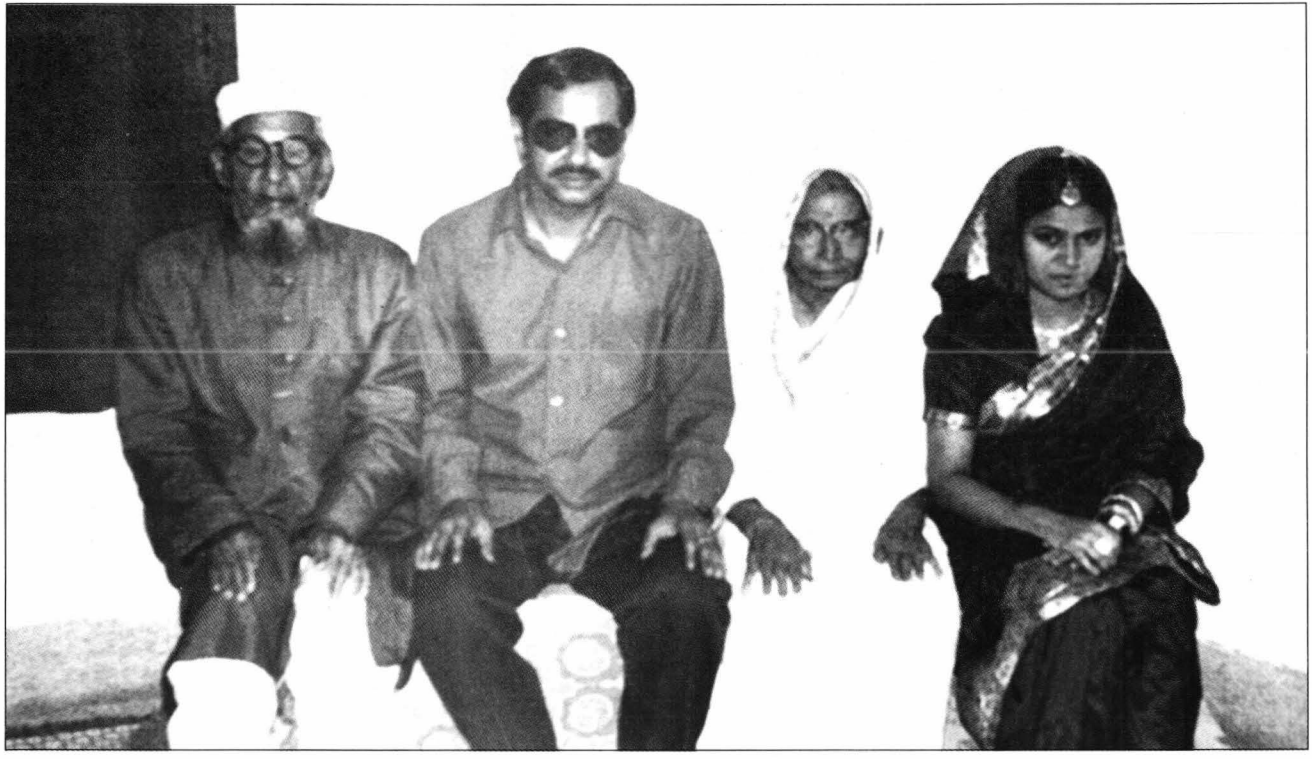

১৯৭৬ সালে পিতা-মাতা ও স্ত্রীর সাথে

www.pathagar.com

১৯৯৩ সালে এনডিএ এর নাগরিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতা দিচ্ছেন সাবেক রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ। সভাপতিত্ব করছেন মুহাম্মদ নূরউল্লাহ। মঞ্চে উপবিষ্ট আনোয়ার জাহিদ, কর্নেল আবদুর রশিদ , এস, এম সোলায়মান. এডভোকেট নূরুল হক মজুমদার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

www.pathagar.com

১৯৭৯ সালে খান এ, সবুর খানের পাকিস্তান সফর উপলক্ষে ইসলামাবাদে আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে খান আবদুল কাইয়ুম খান, জেনারেল হাবিব উল্লাহ খান, মাহমুদ আলী , মাহমুদ আলী কাসুরী , এ কে ব্রোহী, জহির উদ্দিন খান, মুহাম্মদ নূরউল্লাহ ও ফেডারেল মন্ত্রীবর্গ।

www.pathagar.com

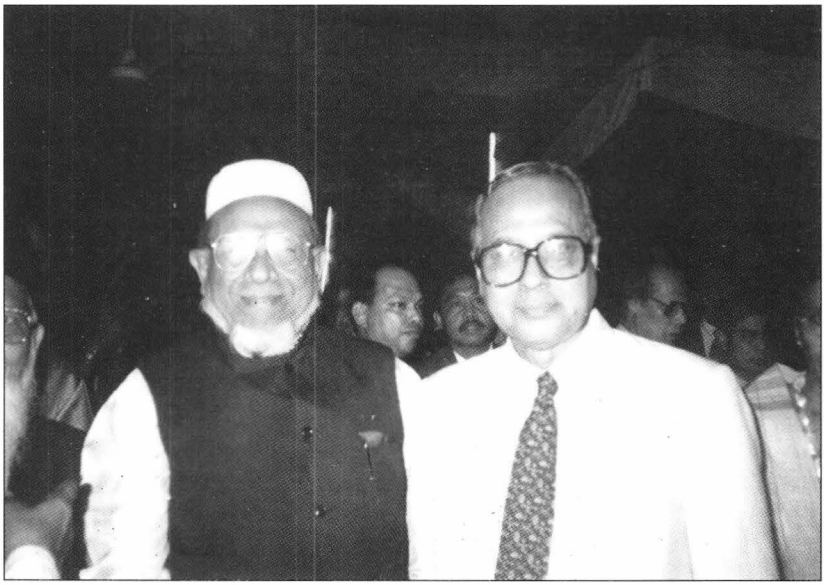

১৯৯৬ সালে ঢাকায় একটি অনুষ্ঠানে আবদুস সামাদ আজদ (পররাষ্ট্র মন্ত্রী)
এর সাথে মুহাম্মদ নূরউল্লাহ

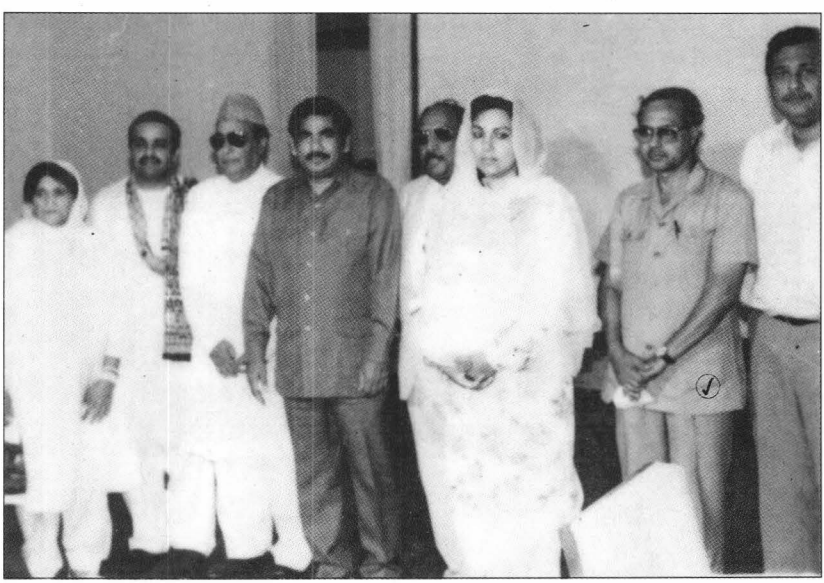

১৯৮৮ সালে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর অফিসে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদের সাথে
পাকিস্তান থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দসহ মুহাম্মদ নূরউল্লাহ ও এ কে ফয়জুল হক

www.pathagar.com

১৯৬২ সালে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়া'র সাথে মুহাম্মদ নূরউল্লাহ রফিক উল্লাহ চৌধুরী, আজিজুর রহমান, মফিজুর রহমান ও অন্যান্যরা

১৯৭২ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আফ্রোএশীয় সলিডারিটি কনফারেন্স এর একটি অনুষ্ঠানে মাঝখানে মুহাম্মদ নূরউল্লাহ পেছনের সারিতে মোল্লা জালাল উদ্দিন, খালেদ মোহাম্মদ আলী ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ মহিউদ্দিন আহমদ

www.pathagar.com

১৯৯৮ সালে ইসলামাবাদে আইওয়ানে ছদর (প্রেসিডেন্ট হাউস) পাকিস্তানের মহামান্য প্রেসিডেন্ট বিচারপতি রফিক তারার সাথে মুহাম্মদ নূরউল্লাহ

১৯৬৮ সালে হোটেল মিসখাতে সাংবাদিকদের সাথে আলাপ করছেন এয়ার মার্শাল আসগর খান মৌলবী ফরিদ আহমদ, মাহমুদ আলী, নূরউল্লাহ ও প্রমূখ

www.pathagar.com

১৯৬৩ সালে মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে নজরুল-রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বক্তৃতারত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডঃ মুহাম্মদ শহীদউল্লাহ। সভাপতিত্ব করছেন মুহাম্মদ নূরউল্লাহ। পাশে উপবিষ্ট প্রিন্সিপাল আবদুস ছোবহান খান চৌধুরী।

১৯৯৮ সালে লাহোরে উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের সাথে

www.pathagar.com

১৯৬৮ সালে লালদীঘি ময়দানেঅনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দওলতানা। মঞ্চে উপবিষ্ট সাবেক প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী , সাবেক প্রধান মন্ত্রী নূরুল আমিন, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান মাহমুদুন্নবী চৌধুরী, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) মুহাম্মদ নূরউল্লাহ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ।

১৯৫৭ সালে মওদুদ আহমদ , মোস্তফা জামান আব্বাছী, আতাউর রহমান খান কায়ছার, মুহাম্মদ নূরউল্লাহ প্রমুখ

www.pathagar.com

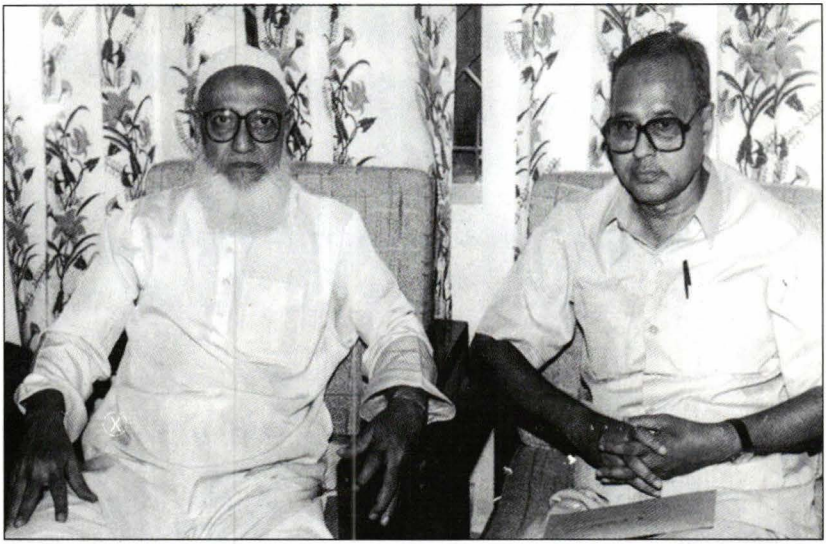

ঢাকায় প্রখ্যাত জননেতা অধ্যাপক গোলাম আজমের সাথে মুহাম্মদ নূরউল্লাহ

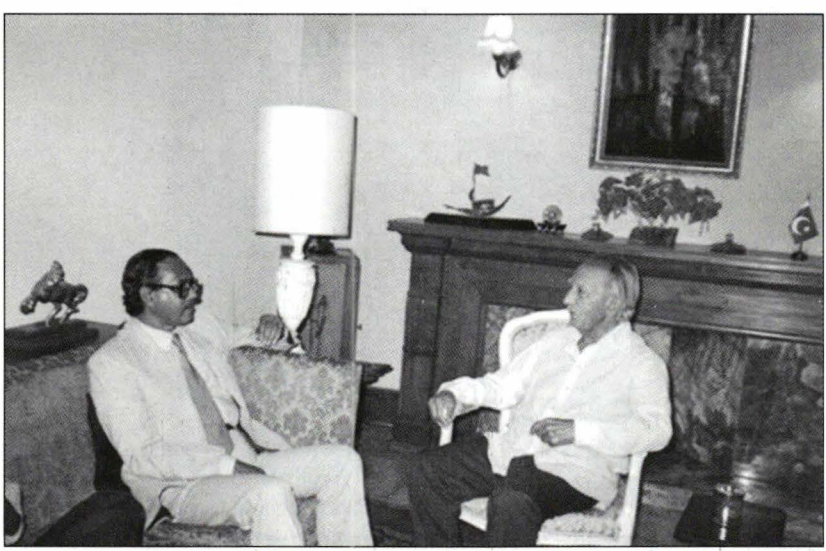

১৯৯২ সালে লাহোরে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল আজম খানের সাথে নূরউল্লাহ

www.pathagar.com

১৯৬৪ সালে লালদীঘি ময়দানে এনডিএফ কর্তৃক আয়োজিত জনসভায় জনাব মাহমুদ আলী বক্তৃতারত। মঞ্চে উপবিষ্ট সর্বজনাব নূরুল আমীন, ইউসুফ আলী চৌধুরী, এস, এম, সোলায়মান, আবদুস সামাদ আজাদ, অলি আহাদ, মাহমুদুন্নবী চৌধুরী ও মুহাম্মদ নূরউল্লাহ

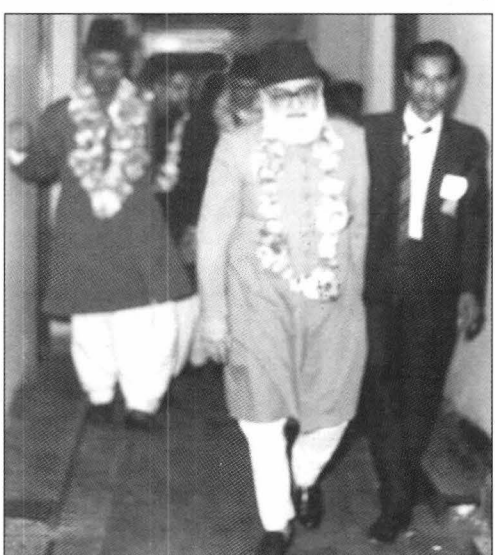

১৯৬৭ সালে আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল আলী মওদুদী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ, মুহাম্মদ নূরউল্লাহ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

www.pathagar.com

১৯৯৭ সালে ইসলামাবাদে পাকিস্তান ন্যাশনাল সেন্টারে শেরে-বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতারত জনাব নূরউল্লাহ। মঞ্চে প্রধান অতিথি ফেডারেল মন্ত্রী মাহমুদ আলী

২০০১ সালে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখছেন চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মুনাওয়ার আহমদ। মঞ্চে উপবিষ্ট পরিচালকবৃন্দ মুহাম্মদ নূরউল্লাহ ডঃ আখতারুজ্জামান, বেনাউল ইসলাম, এ জেড এম সামসুল আলম, শাহাবুদ্দীন খান,ফরিদ হোসাইন এডভোকেট শফিক আহমদ, প্রফেসর এ টি এম ফজলুল হক, এডভোকেট জিয়া হাবিব

www.pathagar.com

১৯৯৬ সালে ইসলামাবাদে মুসলিম লীগ হাউসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মাননীয় স্পীকার গওহর আইয়ুব খান ও পররাষ্টমন্ত্রী সরতাজ আজিজ খানের সাথে মুহাম্মদ নূরউল্লাহ

১৯৬৪ সালে জনাব নূরুল আমিনকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন মাহমুদুন্নবী চৌধুরী, মুহাম্মদ নূরউল্লাহ প্রমুখ।

www.pathagar.com

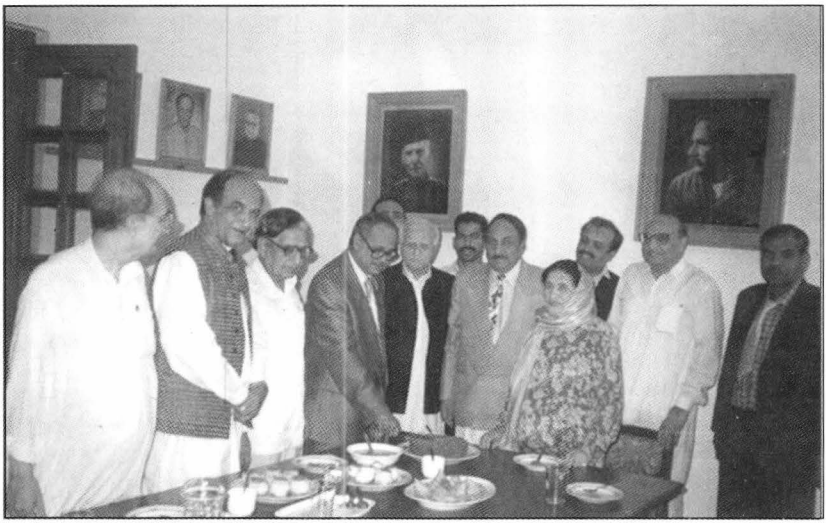

১৯৯৮ সালে লাহোরে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে মুহাম্মদ নূরউল্লাহ কেক কাটছেন

১৯৯৬ সালে পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি ডঃ নাসিম হাছান শাহ এর
সাথে লাহোরে এক অনুষ্ঠানে মুহাম্মদ নূরউল্লাহ

www.pathagar.com

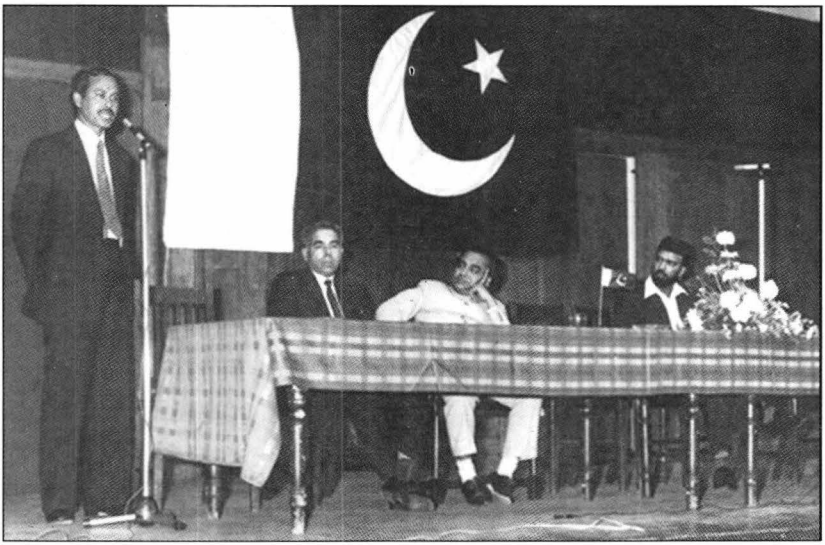

১৯৭৪ সালে লন্ডনে কনওয়ে হলে পাকিস্তান সোসাইটি কর্তৃক পাকিস্তান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতারত মুহাম্মদ নূরউল্লাহ. মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি ফেডারেল মন্ত্রী জনাব মাহমুদ আলী ও সোসাইটির প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী

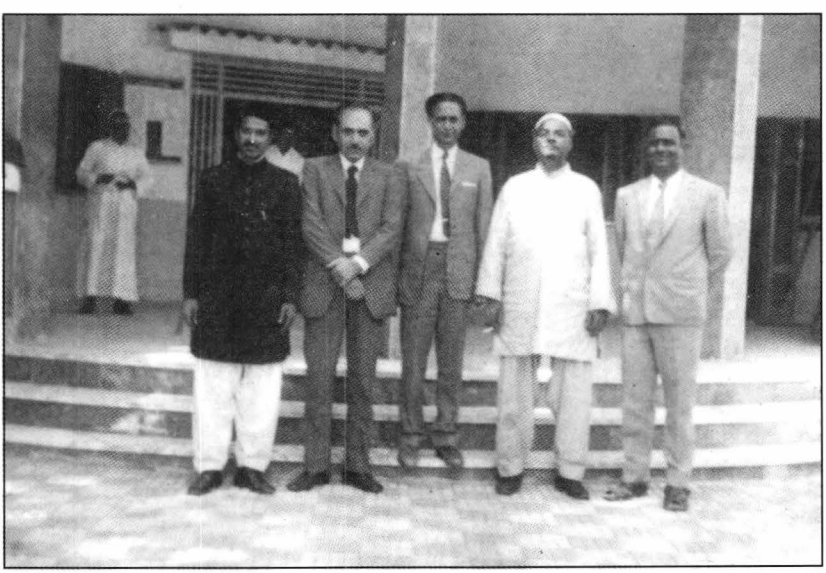

১৯৭২ সালে জেদ্দাস্থ পাকিস্তানী দূতাবাসের সামনে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতের সাথে মুহাম্মদ নূরউল্লাহ (শেরওয়ানী) ও দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ

www.pathagar.com

ঢাকায় একটি অনুষ্ঠানে সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার জাহিদ, মন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম
এর সাথে মুহাম্মদ নূরউল্লাহ

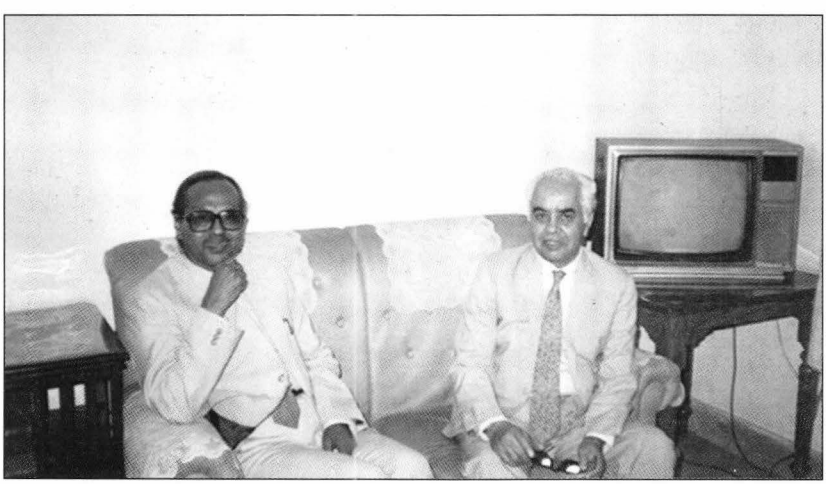

১৯৯৭ সালে লাহোরে উপমহাদেশের অন্যতম বহুল প্রচারিত দৈনিক নওয়াইওয়াক্ত
ও দৈনিক দি নেশান পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মজিদ নিজামীর সাথে মুহাম্মদ নূরউল্লাহ

www.pathagar.com

লাহোরে ২০০১ সালে কায়েদে আজমের ১২৫ সালা জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি মুহাম্মদ নূরউল্লাহ বক্তৃতা করছেন।

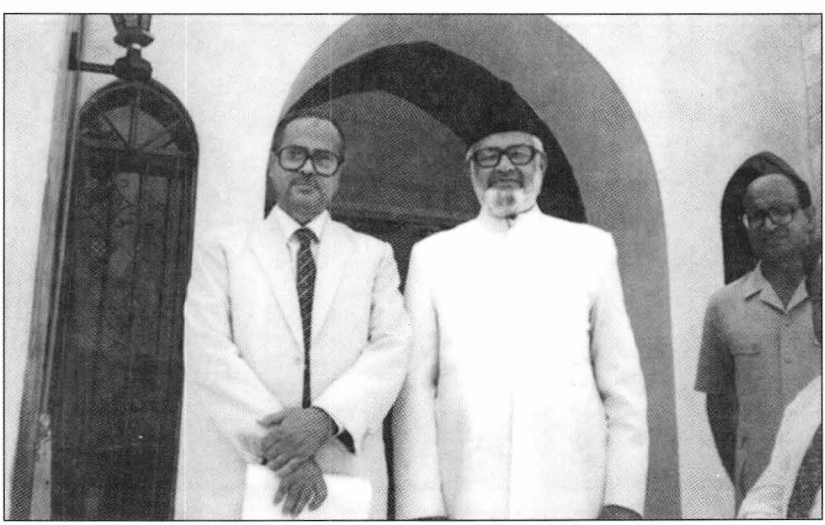

ইসলামাবাদে সাবেক ডেপুটি স্পীকার বিচারপতি আফজল চীমার সাথে মুহাম্মদ নূরউল্লাহ

www.pathagar.com

১৯৯৪ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে জেনারেল রাও ফরমান আলী খান এর সাথে মুহাম্মদ নূরউল্লাহ

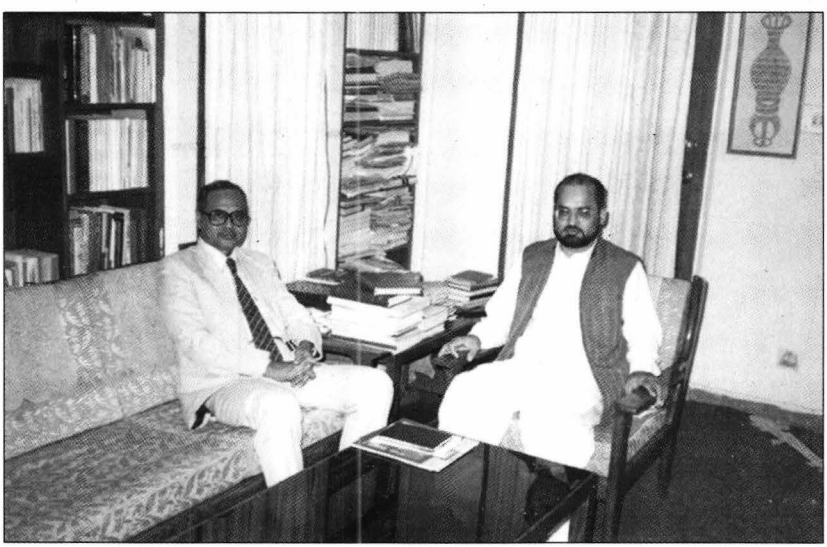

ইসলামাবাদে ফেডারেল ধর্মমন্ত্রী ডঃ মাহমুদ গাজীর সাথে মুহাম্মদ নূরউল্লাহ

www.pathagar.com

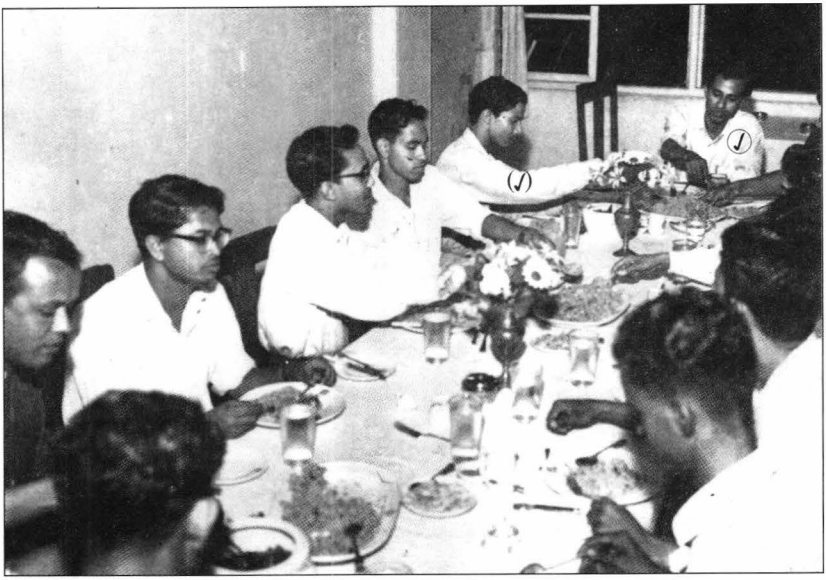

১৯৬৪ সালে হোটেল মিসখা'য় "বন্ধনী" কর্তৃক আয়োজিত মাসিক ভোজ সভায়
ডঃ মুহাম্মদ ইউনুছ (প্রতিষ্ঠাতা, গ্রামীণ ব্যাংক) মুহাম্মদ নূরউল্লাহ প্রমূখ

১৯৮৬ সালে লাহোরে চাম্বা হাউসে (সার্কিট হাউস) জনাব মুহাম্মদ নূরউল্লাহ
সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করছেন।

www.pathagar.com

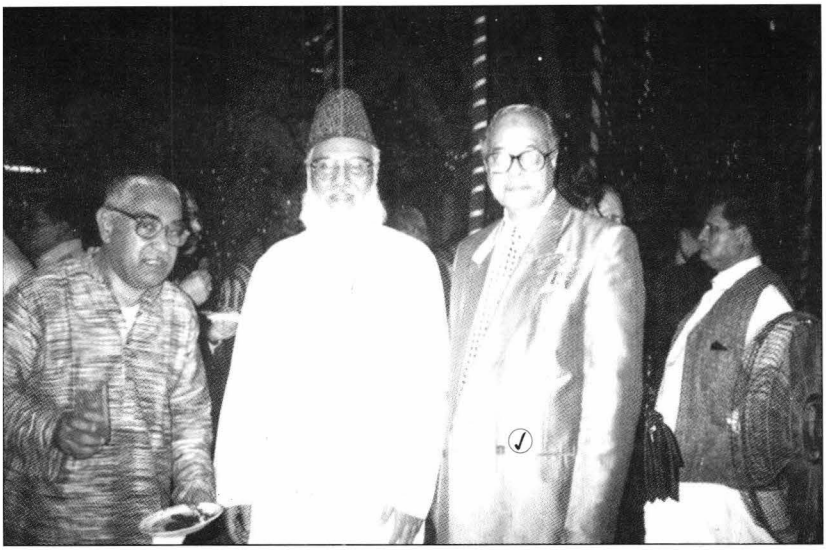

ঢাকায় একটি অনুষ্ঠানে জামায়েতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
প্রখ্যাত সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী ও মুহাম্মদ নূরউল্লাহ প্রমূখ

১৯৯৭ সালে ইসলামাবাদের হলিডে ইন হোটেলে তাহরিকে তাকমিলে পাকিস্তান কর্তৃক
আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে জনাব মুহাম্মদ নূরউল্লাহ বক্তব্য দিচ্ছেন।

www.pathagar.com

ঢাকায় একটি অনুষ্ঠানে কাজী আব্দুল কাদের, সিরাজউদ্দিন, ব্যারিষ্টার কোরবান আলী, মুহাম্মদ নূরউল্লাহ প্রমুখ

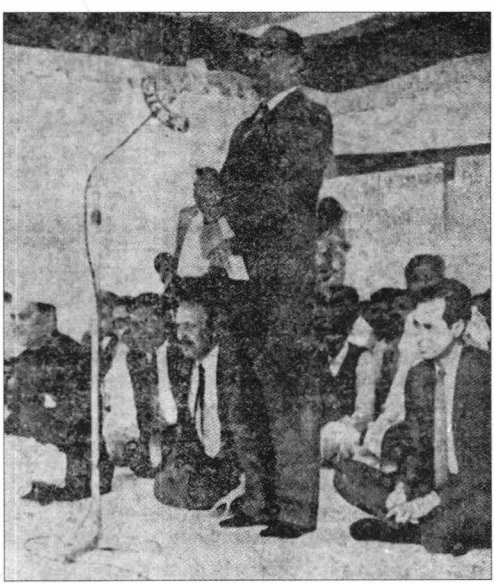

১৯৭০ সালে ২রা ফেব্রুয়ারী পল্টন ময়দানে পিডিপি'র জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন আবদুস সালাম খান। পাশে উপবিষ্ট মুহাম্মদ নূরউল্লাহ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

www.pathagar.com

নূরউল্লাহ'র সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

জন্মঃ

প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক, বাহক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর হযরত বায়েজীদ বোস্তামীর পূণ্যভূমি, অসংখ্য মরমী, সুফী সাধক ও আওলিয়ার লীলাভূমি, পৃথিবীর বৃহত্তর সাগর সৈকত পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ এই বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই থানার হাইতকান্দি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে মুহাম্মদ নূরউল্লাহ ১৯৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম এডভোকেট জালাল উদ্দিন আহমদ। তিনি ছিলেন এলাকার উচ্চ শিক্ষিত, আইনজীবী এবং অন্যদিকে বিদ্যোৎসাহী সমাজসেবক এবং তিনি দীর্ঘ ২২ বছর ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যন ছিলেন। দাদা মরহুম আবদুল গফুর ভুঁইয়া ছিলেন একজন প্রভাবশালী জমিদার। মাতা মরহুমা মোছাম্মৎ পাঞ্জুবের নেসা। নানা মরহুম আলী আহমদ ভুঁইয়া। তিনিও জমিদার ও দানবীর ছিলেন।

শিক্ষা জীবনঃ

মুহাম্মদ নূরউল্লাহ'র পারিবারিক পরিবেশে প্রাথমিক শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি হয়। নিজ বাড়ীর প্রাঙ্গণে প্রাইমারী স্কুলে একাডেমিক শিক্ষার যাত্রা শুরু। বন্দর নগরীর প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম সরকারী মুসলিম হাইস্কুল থেকে ১৯৫৪ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এই স্কুলের ছাত্রাবস্থায় জেনারেল ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হয়ে হাতে কলমে যথাযথভাবে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের প্রশিক্ষণের সুযোগ পান। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে চট্টগ্রাম ল' কলেজে আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান।

সাংগঠনিক কর্ম তৎপরতাঃ

একাডেমিক শিক্ষা জীবনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। জনাব নূরউল্লাহ চট্টগ্রাম কলেজে সংসদ নির্বাচনে প্রথম বিরোধী সংগঠন ষ্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন গঠনের প্রধান সংগঠক ছিলেন। এখান থেকেই মূলতঃ জনাব নূরউল্লাহ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মকান্ডে উৎসাহিত অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে নিজকে সম্পৃক্ত করেন। স্কুল জীবনে রাজনীতিতে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করেন প্রখ্যাত সমাজসেবক ইঞ্জিনিয়ার আজিজুর রহমান। তিনি যেসব সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তৎকালীন পাকিস্তান ছাত্র শক্তির জেলা সভাপতি, পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের জেলা সেক্রেটারী, পাকিস্তান যুব শিবিরের আহবায়ক। তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বরেণ্য নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয়তাবাদী সংগঠন ন্যাশনালিস্ট ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স (এনডিএ) চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি ছিলেন।

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় কমিটির এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট ছিলেন কর্ণেল (অব) খন্দকার আবদুর রশীদ, সেক্রেটারী জেনারেল আনোয়ার জাহিদ। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ পাকিস্তান মৈত্রী সমিতি এবং বাংলাদেশ ক্রিসেন্ট সোসাইটির উপদেষ্টা। এই সব সংগঠনের দায়িত্ব পালনে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন এবং একজন সৎ রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে সর্বমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছেন।

বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকাঃ

প্রবল দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত একজন সচেতন নাগরিক বিবেকের তাগিদে দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে উঠে। এই দায়িত্ববোধ থেকেই তিনি জাতীয় সংকটময় মুহূর্তে ও বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। তেমনি জনাব নূরউল্লাহ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের স্থপতি প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম-এর সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। ১৯৫৪ সনে ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে বিজয়ের জন্য তাঁর প্রশংসনীয় অবদান রয়েছে। ১৯৫৭ সালে দেশব্যাপী "কাশ্মীর দিবস" পালনোপলক্ষে চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন মুহাম্মদ নূরউল্লাহ। প্রধান অতিথি ছিলেন শাহ আবদুল হালিম, বক্তব্য রাখেন ফারুক মাহমুদ, ইসলামী ছাত্র সংঘের মাওলানা ইলিয়াছ প্রমুখ। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক আইন জারীর পর শিক্ষা আন্দোলনসহ প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাদপীঠ ছিলো জনাব নূরউল্লাহের ৮৩, স্টেশন রোড, চট্টগ্রাম-এর বাসভবন। তাঁর বাসভবন থেকেই তৈরী হতো সমগ্র জেলাব্যাপী বিভিন্ন আন্দোলন পরিচালনার পরিকল্পনা বা দিকনির্দেশনা। ১৯৬২ সালে তাঁর একক প্রচেষ্টায় মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে "মাধ্যমিক স্কুল ছাত্র পরিষদ" নামে একটি সংগঠন গঠন করেন যার অফিস ছিল নূরউল্লাহর বাসভবন ৮৩, ষ্টেশন রোড। সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে স্কুল ছাত্রদের সংগঠিত করে আন্দোলন জোরদার করা। এ সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন নূরুন্নবী চৌধুরী, সামসুল আলম চৌধুরী, আব্দুর রাজ্জাক মাহমুদ চৌধুরী, (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর বড় ভাই), শরীফ মসিউদ্দৌলা, আবদুর রউফ (পরে শহীদ), শেখ জামাল উদ্দিন, আবু নছর খান, সৈয়দ আবু তালেব, শফি নিজামী প্রমুখ। তিনি এদের সবাইকে রাজনীতিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় করেন। সামরিক আইনের যাঁতাকলে রাজনৈতিক পরিবেশ যখন মুহ্যমান, সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ, তখন ১৯৬২ সালে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে উঠেন নয় জন নেতা, যা নয় নেতার বিবৃতি হিসাবে পরিচিত। এঁরা হলেন সর্বজনাব নূরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, হামিদুল হক চৌধুরী, ইউছুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া, মাহমুদ আলী, আবু হোসেন সরকার, পীর মোহসেন উদ্দীন দুদু মিয়া, সৈয়দ আজিজুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান। নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন নূরুল আমিন। এঁদের সম্মিলিত প্রয়াসে সুযোগ্য নেতৃত্বের ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন তীব্র হলেও চট্টগ্রামের আন্দোলন ছিলো সবচেয়ে তুঙ্গে। চট্টগ্রামের এই তীব্র আন্দোলনের মুখে শাসকগোষ্ঠি দিশেহারা হয়ে গ্রেফতার করেন

www.pathagar.com

সর্বজনাব নূরউল্লাহ, ফেরদৌস কোরাইশী, মোহাম্মদ হোসেন খান, এডভোকেট মহসিন, ডঃ রশিদ আল ফারুকীকে (খায়রুল বশর তাঁর নাম)। এছাড়া হুলিয়া ছিলো অনেক নেতার উপর। ১৯৬২ এর আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের যারা নেতৃত্ব দেন তাদের মধ্যে সর্বজনাব নূরউল্লাহ, হারুন খান, মোহাম্মদ হোসেন খান, এম. এ. মান্নান, আশরাফ খান, কাজী জাফরুল ইসলাম, মাহবুবুল আলম তারা, শায়েস্তা খান, এ, ওয়াই, খালেদ, ফেরদৌস কোরাইশী, আবু ছালেহ চৌধুরী, আবু তাহের মাসুদ, আবুল কাসেম, বদরুল কামাল, আবদুল্লাহ আল-নোমান, জাহাঙ্গীর আলম, কাজী নজরুল ইসলাম, এস,এ, খান (সেলিম), মহিউদ্দিন চৌধুরী, কাজী ফরিদ, মোঃ শহীদুল্লাহ, আবুল কালাম আজাদ, শাখাওয়াত হোসেন মোহাম্মদ ইউনূছ, মীর কাশিম আলী, আবু নাছের, ইদ্রিস আলম, হারুন-অর-রশীদ, জামাল উদ্দিন কলামিষ্টসহ আরো অনেকে। তাঁদের তীব্র আন্দোলন, ঐতিহাসিক ঘোষণা ও বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে নূতন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা হয়। গঠিত হয় ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ)। জনাব মুহাম্মদ নূরউল্লাহ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে শরীক হন এবং চট্টগ্রাম জেলা এনডিএফ এর সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। যার সভাপতি ছিলেন সাবেক মন্ত্রী চট্টগ্রামের প্রবীণ জননেতা জনাব আলহাজ্ব মাহমুদুন্নবী চৌধুরী। এনডিএফ-এর কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট জনাব নূরুল আমিন, সেক্রেটারী জেনারেল মাহমুদ আলী, পূর্ব পাকিস্তানের সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন আবদুস সামাদ (আজাদ) সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী। পরবর্তীতে তিনি ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির (পিডিপি'র) জেলা সেক্রেটারী এবং প্রাদেশিক কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন জনাব নূরুল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন এয়ার মার্শাল (অব) আসগর খান ও মাহমুদ আলী। সেক্রেটারী জেনারেল নাছিম হাছান শাহ, পূর্ব পাকিস্তান পিডিপি'র প্রেসিডেন্ট আবদুস সালাম খান, সেক্রেটারী জেনারেল ছৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নওয়াবজাদা নছরুল্লাহ খান। জনাব নূরউল্লাহ কেন্দ্রীয় পিডিপি'র কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং পিডিএম ও ডাক-এর নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ-এর পক্ষে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। জনাব নূরউল্লাহ অবিভক্ত পাকিস্তানের সর্বশেষ জাতীয় পরিষদের সদস্য (এমএনএ) পদে নির্বাচিত হন। ১৯৬২ হতে ১৯৭০ সন পর্যন্ত প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন। চট্টগ্রামে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে তিনি সর্বজনাব মাহমুদুন্নবী চৌধুরী, জহুর আহমদ চৌধুরী, এম,এ, আজিজ, আজিজুর রহমান, আমির হোসেন দোভাষ, এম,এ, মান্নান, মাওলানা মোঃ শামসুদ্দীন, এডভোকেট নূরুন্নবী চৌধুরী, মাওলানা বদিউল আলম প্রমুখ একযোগে কাজ করেন। সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে দলমত নির্বিশেষে সবাই তাঁকে পছন্দ করতেন। তিনি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমিন ও পাকিস্তানের ফেডারেল মন্ত্রী জনাব মাহমুদ আলীর রাজনৈতিক সচিব হিসাবে দীর্ঘকাল নিয়োজিত ছিলেন।

গণতান্ত্রিক ও ছাত্র আন্দোলনের ফাঁকে সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। 'বন্ধনী' নামে একটি সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের

www.pathagar.com

গুরুদায়িত্বে ছিলেন। উক্ত সংগঠনের সভাপতি ছিলেন জনাব ডঃ মুহাম্মদ ইউনুছ (প্রতিষ্ঠাতা, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক)। এই সংগঠনের মাসিক বিশেষ সভায় অধ্যাপক আবুল ফজল, অধ্যাপক রেহমান সোবহান প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকতেন। এই সংগঠনের সঙ্গে আর যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বজনাব মুনাওয়ার আহমদ, খালেদ, হোসাইন ইমাম, সামসুদ্দিন, আব্দুর রহিম চৌধুরী, জাহাঙ্গীর উদ্দিন চৌধুরী, এয়াছিন চৌধুরী, রহিমুল আলম, আব্দুল মোমিন দোভাষ, আব্দুল মালেক (আজাদী) সহ অনেকে।

এছাড়া, সে সময় হোটেল মিসখা ও রিডার্স চেম্বার ছিল সমস্ত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের আড্ডার স্থান। এসব স্থানে ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রশক্তি, ছাত্রলীগ, ছাত্র সংঘ সহ সকল সংগঠনের কর্মীরা এক সাথে বসে আড্ডা দিতেন। সে সময় একে অপরের সাথে সুমধুর সম্পর্ক ছিল।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি নূরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী, আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার, মাহমুদ আলী, মৌলবী ফরিদ আহমদ, ইউছুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), অধ্যাপক গোলাম আজম, জেনারেল আয়ুব খান, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, মিয়া মমতাজ দৌলতানা, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, জুলফিকার আলী ভুট্টো, এয়ার মার্শাল আসগর খান, জেনারেল আজম খান এবং জেনারেল জিয়াউল হকের ন্যায় প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছেন। পাকিস্তানের সর্বশেষ নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি রফিক তারার সাথেও তাঁর ভাল সম্পর্ক ছিল। গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জনাব নূরউল্লাহ দু'বার কারাভোগ করেন এবং বহুবার হুলিয়া কবলিত হন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নূরউল্লাহ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেননি। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে তিনি এবং করাচী থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'ডন' পত্রিকার ব্যুরো চীফ ফজলুর রহমানসহ 'শান্তি কমিটি' গঠনের উদ্যোগ নেন। পরে একেএম রফিকউল্লাহ চৌধুরীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে নিয়ে সর্বদলীয় শান্তি কমিটি গঠনকল্পে এক সভা মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে আহবান করেন। সভায় একমাত্র বক্তা হিসেবে নূরউল্লাহ শান্তি কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। উক্ত সভায় একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহবায়ক নির্বাচিত হন প্রবীণ জননেতা মাহমুদুন্নবী চৌধুরী এবং সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব নেন মুহাম্মদ নূরউল্লাহ, পরে কমিটির সেক্রেটারী হন বদিউল আলম। ষ্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন মন্ত্রী সুলতান আহমদ। শান্তি কমিটির মাধ্যমে তিনি জনগণকে পাকিস্তানী সৈন্যদের নির্যাতন থেকে বাঁচানোর জন্য শান্তি কমিটি ও পিডিপির পক্ষ থেকে নিজের দস্তখতে শত শত আইডেন্টিটি কার্ড দলমত নির্বিশেষে প্রদান করেন। তিনি এবং মাহমুদুন্নবী চৌধুরী জেলার প্রতিটি থানায় গিয়ে জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে সাহায্য সহযোগিতা করেন। সে সময় দৈনিক আজাদীসহ অনেকগুলো পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিনি জনাব নূরুল আমিনের মাধ্যমে পত্রিকা পুনঃপ্রকাশনার অনুমতি ও তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী জনাব মজিবুর

www.pathagar.com

রহমানকে দিয়ে সরকারী বিজ্ঞাপন সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনেঃ

দেশীয় রাজনীতির পাশাপাশি জনাব নূরউল্লাহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭২ সনের জানুয়ারীতে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আফ্রো -এশীয় সংহতি সম্মেলনে তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে যোগদান করেন। পাকিস্তানের নেতৃত্ব দেন জনাব মাহমুদ আলী, ভারতের নেতৃত্ব দেন কৃষ্ণমেনন এবং পর্যবেক্ষক হিসাবে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেন মন্ত্রী মোল্লা জালাল উদ্দিন। অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন বরিশালের মহিউদ্দিন আহমেদ, সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক বজলুর রহমান, এমপি খালেদ মোহাম্মদ আলী। তিনি ১৯৭৪ সালে লন্ডনসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দু'সদস্য বিশিষ্ট সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে সফর করেন। এছাড়া তিনি মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্য গড়ে তোলার স্বপক্ষে গ্লাসগো, বার্মিংহাম, প্যারিস, ইতালীর রোম, কুয়েত, দুবাই এবং লন্ডনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গঠনমূলক বক্তব্য রাখেন। তিনি সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে ইউরোপসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ সফর করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে পাকিস্তান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক তাহরিকে তাকমিলে পাকিস্তান সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৮৮ সালে পাকিস্তান ফেডারেল সরকারের আমন্ত্রণে লাহোরে অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিবস পদক বিতরণ অনুষ্ঠানেও বিশেষ মেহমান হিসাবে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেঃ

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জনাব নূরউল্লাহর বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর প্রতিষ্ঠাতা ট্রাষ্ট এর সদস্য ও সিন্ডিকেট সদস্য। চট্টগ্রাম বাংলা কলেজের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং হাইতকান্দি স্কুলেরও একজন প্রতিষ্ঠাতা। নিজামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা প্রশংসনীয়। সম্প্রতি মিরসরাইতে প্রতিষ্ঠিত প্রফেসর কামালউদ্দিন চৌধুরী কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। ১৯৬৩ সনে সর্বদলীয় ছাত্র সংগঠন ও কলেজ ছাত্র সংসদের উদ্যোগে নজরুল রবীন্দ্র জয়ন্তী কমিটির সভাপতি ছিলেন। আর সম্পাদক ছিলেন সাবেক এমপি, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব হারুন-অর-রশিদ খান। এই কমিটিতে তদানীন্তন সমস্ত ছাত্র সংগঠনগুলোর সভাপতি ও সেক্রেটারী এবং কলেজের ছাত্র সংসদগুলোর ভিপি ও জিএস সদস্য ছিলেন। এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন ডঃ মোহাম্মদ শহীদউল্লাহ, ডক্টর কাজী দীন মোহাম্মদ, কবি মঈনউদ্দিন খান, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খান প্রমুখ। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে টেপ করে বাণী পাঠিয়েছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্ণর লেঃ জেনারেল আজম খান। ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান ছাত্র শক্তির কেন্দ্রীয় সম্মেলনে চট্টগ্রাম থেকে তিনি প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। কেন্দ্রীয় প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব মওদুদ আহমদ (সাবেক প্রধানমন্ত্রী), শাহ আব্দুল হালিম, ফারুক মাহমুদ, মোজাফফর হোসেন পল্টু (আওয়ামী লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী জেনারেল), জনাব মোশাররফ হোসেন (সাবেক এম,পি,) মিজানুর রহমান শেলী, মোবায়েদুর রহমান,

www.pathagar.com

মোস্তাফা জামান আব্বাসী প্রমুখ। পাকিস্তান ছাত্র শক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত ছাত্রনেতা ফরমান উল্লাহ খান। তিনি দেশের সর্ববৃহৎ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির অন্যতম পরিচালক। তিনি চট্টগ্রাম শিশু হাসপাতালের ও আজীবন সদস্য, তিনি চট্টগ্রামস্থ প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং জাতীয় শিশু কিশোর প্রতিষ্ঠান ফুলকুঁড়ি এর অন্যতম উপদেষ্টা। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত আছেন। তিনি গত তিন বছর যাবত কলিকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বই মেলায় অংশগ্রহণ করছেন।

সমাজসেবাঃ

সমাজসেবায় তিনি সব সময় প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসে জনগণ যখন বিপদগ্রস্ত তখন তিনি চট্টগ্রাম সিটিজেন্স রিলিফ কমিটি ও তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বিতরণ করে সবার প্রশংসা অর্জন করেন। যখনই কোন দুর্যোগ হতো সেখানে তিনি ছুটে যেতেন।

পেশাঃ

জনাব নূরউল্লাহ পুস্তক প্রকাশনা ও ছাপাখানা শিল্পের সাথে দীর্ঘদিন যাবত জড়িত আছেন। তাঁর আন্তরিক কর্মপ্রচেষ্টায় গঠিত হয়েছিলো রিডার্স চেম্বার ও চেম্বার প্রেস লিমিটেড। বর্তমানে তিনি নিশান প্রিন্টার্স-এর স্বত্বাধিকারী।

সাংবাদিকতাঃ

সাংবাদিকতায় তিনি তৎকালীন দৈনিক বুনিয়াদ এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত ব্যতিক্রমধর্মী সাপ্তাহিক "পূর্ব দিগন্ত" এর সম্পাদক। তিনি চট্টগ্রাম সংবাদপত্র পরিষদের সম্মানিত সদস্য ও চট্টগ্রাম প্রেস মালিক সমিতিরও সহ-সভাপতি। তিনি পাকিস্তানের ইসলামাবাদ থেকে প্রকাশিত মাসিক "দি কনসেপ্ট" পত্রিকার ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য। স্কুলজীবনে তিনি 'নবীন তুলি' নামে একটি সংকলন বের করেন।

কৃতিত্বঃ

তিনি চারবার সরকারী দলের প্রতিনিধি হিসেবে হজ্জব্রত পালন করেন। ১৯৭২ সালে সরকারী দলের প্রতিনিধি হিসেবে হজ্জ পালনকালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সমস্ত হাজী সাহেবান হজ্জ পালন করেন তাদেরকে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানোর ব্যাপারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। জেদ্দাস্থ পাকিস্তানী দূতাবাস ও ইসলামাবাদে বিদেশ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে তিনি উল্লেখিত সফলতা অর্জন করেন।

পারিবারিক জীবনে তিনি স্ত্রী দিলারা বেগম, দু'মেয়ে মাহনাজ নূর ও ফারাহনাজ নূর এবং এক ছেলে আহমদ সরফরাজ নূরকে নিয়ে স্বচ্ছন্দ পরিবেশে সুখী।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

দফার রাজনীতি

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা

[ডিসেম্বর ১৯৫৩]

১। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে।

২। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হবে এবং উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সংগতভাবে হ্রাস করা হবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হবে।

৩। পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববংগ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করে পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং লীগ মন্ত্রীসভার আমলের পাট কেলেংকারী তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৪। কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে ও সরকারী সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে।

৫। পূর্ব বংগকে লবণশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির-শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করা হবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার আমলের লবণের কেলেংকারী সম্পর্কে তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে ও তাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৬। শিল্প ও কারিগর শ্রেণীর গরীব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করে তাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হবে।

৭। খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হতে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করা হবে।

৮। পূর্ব বংগকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করে ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করে শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

৯। দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সংগত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১০। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকর করে কেবল মাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে এবং সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠিয়ে দিয়ে একই পর্যায়ভূক্ত করে সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

www.pathagar.com

১১। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে উচ্চ শিক্ষাকে সস্তা ও সহজ-লভ্য করা হবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হবে।

১২। শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমিয়ে ও নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়িয়ে তাদের আয়ের একটি সুসংগত সামঞ্জস্য বিধান করা হবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজারের বেশী বেতন গ্রহণ করবেন না।

১৩। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা করা হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী পদাধিকারী ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৪। জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালা-কানুন রদ ও রহিত করতঃ বিনাবিচারে আটক বন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করবার অধিকার অবাধ ও নিরংকুশ করা হবে।

১৫। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হতে পৃথক করা হবে।

১৬। যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়ীতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাততঃ ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হবে।

১৭। বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবীতে যারা মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার গুলিতে শহীদ হয়েছেন, তাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হবে এবং তাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

১৮। ২২শে ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ঘোষণা করে উহাকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করা হবে।

১৯। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বংগকে পূর্ণ-স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও সার্বভৌমিক করা হবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববংগ সরকারের হাতে আনয়ন করা হবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থল বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হবে।

২০। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

২১। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হবে, তিন মাসের মধ্যে তা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হলে মন্ত্রীসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন।

www.pathagar.com

কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজাম-ই-ইসলাম পার্টির ১০ দফা

[২৮ ডিসেম্বর, ১৯৫৩]

১। যুক্তফ্রন্টের অংগ সংগঠন হিসেবে ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তান এবং তার ঐক্য, নিরাপত্তা ও সংহতির মুল ভিত্তি ও আদর্শ দ্বিজাতি তত্ত্বকে উভয় দল তাদের সকল তৎপরতার প্রধান লক্ষ্যরূপে ঘোষণা করছে, এই আদর্শকে সমুন্নত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উভয় দল অংগীকার করছে যে, দ্বিজাতি তত্ত্ব এবং তার মুলনীতি-বিরোধী কোনো মতবাদ বা কার্যক্রমকে তারা কোনোক্রমেই কখনো সমর্থন করবে না।

২। উভয় দল আন্তরিকভাবে এই মর্মে ঘোষণা করছে যে, '৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত ওলামা কনভেনশনের প্রস্তাব ও সুপারিশের আলোকে এবং পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশের ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য তারা সর্বাত্মকভাবে প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

৩। উভয় দল এই মর্মে অংগীকার করছে যে তারা শরীয়ত বিরোধী প্রচলিত সকল আইনের আশু বাতিল এবং কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক আইনকে পাকিস্তানের কেন্দ্র ও প্রদেশের সর্বত্র অবিলম্বে প্রয়োগ করার লক্ষ্যে ঐকান্তিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৪। চুক্তিবদ্ধ কোনো দলের পূর্ব-গৃহীত কোনো প্রস্তাব, ঘোষণা বা বিবৃতিতে যদি ওপরে বর্ণিত শর্ত-বিরোধী কোনো বক্তব্য থেকে থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট দলটিকে আট দিনের মধ্যেই তা বাতিল করতে হবে এবং এখানে স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করে দলীয় বক্তব্য সংশোধন এবং সেই আলোকে নির্বাচনী ঘোষণা প্রকাশ করতে হবে।

৫। প্রথম ও তৃতীয় দফায় বর্ণিত কর্মসূচীর বাস্তবায়ন এবং জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে উভয় দলকেই নিজ নিজ পদ্ধতিতে প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং তাদের মনোনীত দু'জন করে প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি যুক্ত পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করা হবে। জনাব এ,কে, ফজলুল হক এর চেয়ারম্যান হবেন এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এই পার্লামেন্টারী বোর্ড নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করবেন। কোনো দলই এমন কোনো প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে পারবেন না, যিদি বা যারা প্রথম ও তৃতীয় দফায় বর্ণিত শর্ত এবং কর্মসূচীর বিরোধী। প্রতিটি প্রার্থীকেই চরিত্রবান এবং ভালো মুসলমান হতে হবে।

৭। যুক্ত পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভায় উভয় দলের সভাপতিরই উপস্থিতি প্রয়োজন হবে এবং তাদের কিংবা প্রতিটি দলের মনোনীত দু'জন প্রতিনিধির স্বাক্ষরবিহীন হলে সভার কোনো সিদ্ধান্তকে বৈধ বলে গণ্য করা হবে না।

৮। আসন্ন নির্বাচনোপলক্ষে যুক্তফ্রন্টে যোগদান করলেও নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি সব সময় তার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মর্যাদা বহাল রাখতে পারবে।

৯। নিম্নস্বাক্ষরকারীদের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত এবং এখানে ঘোষিত কর্মসূচীর প্রতি আনুগত্য ব্যতীত চুক্তিবদ্ধ দু'টি দলের বাইরে অন্য কোনো দলকে এই যুক্তফ্রন্টে যোগদান করতে দেয়া হবে না।

১০। কোনো একটি দল যদি কখনো কোনো শর্ত ভংগ করে তাহলে অন্য দল যে কোনো সময় এই চুক্তিকে বাতিল ঘোষণা করার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানীর ২৪ দফা

[মে, ১৯৫৫]

১। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধু সামরিক বিভাগ (নৌ বিভাগের সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে থাকবে), মুদ্রা প্রস্তুত, বৈদেশিক নীতি (বৈদেশিক বাণিজ্য পূর্ব পাকিস্তানের থাকবে) এই ক্ষমতা তিনটি ছাড়া সমস্ত্র ক্ষমতা এবং যুক্ত নির্বাচন আদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ করে প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ হতে পূর্ব বংগের আইন পরিষদের আসন্ন বৈঠকে প্রস্তাব পাশ করতে হবে।

২। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।

৩। নূরুল আমিন সরকার ৬০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ নামে যে প্রজা উচ্ছেদ আইন করে রেখেছে, সেই আইন বাতিল করে সত্বর আইন সভা আহবান করে বিনা ক্ষতিপূরণে ২১-দফা ওয়াদা অনুযায়ী জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের আইন পাশ করতে হবে। খাজনার হার কম, সার্টিফিকেট প্রথা রহিত, বকেয়া খাজনার সুদ ও নদীসিকস্তি জমির নজরানা মওকুফ করতে হবে।

৪। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, সিয়াটো চুক্তি, পাক-বাগদাদ চুক্তি প্রভৃতি জাতীয় সংহতির পরিপন্থী সাম্রাজ্যবাদী চুক্তি বাতিল করতে হবে। গত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত অধিকাংশ পরিষদ সদস্য ওয়াদাবদ্ধ হয়ে সামরিক চুক্তি বাতিলের জন্য যে মর্মে দস্তখত দিয়েছিলেন সে মর্মে আইন পরিষদে প্রস্তাব পাশ করতে হবে।

৫। স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের ছাত্রদের বর্তমান বেতনের হার এবং হোষ্টেল খরচ অবিলম্বে হ্রাস করতে হবে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করতে হবে।

৬। লিকুইডেটেড ও গ্রাম্য সমবায় সমিতিসমূহের খাতক নির্ধারিত কিস্তিবন্দী মোতাবেক কিস্তির টাকা আদায় করতে হবে। ঋণসালিশী বোর্ড কর্তৃক মাফ দেয়া সুদ (কনট্রিবিউশন) আদায় ও সার্টিফিকেট বন্ধ করতে হবে। যাদের কিস্তিবন্দী করা হয় নাই তাদের জন্য কিস্তি নির্ধারণ করতেই হবে।

৭। (ক) পাটের মূল্য ন্যূনপক্ষে প্রতি মণ ৩০ টাকা বেঁধে দিতে হবে। শুধু কয়েকজন ব্যবসায়ীকে পাট বিক্রয়ের লাইসেন্স না দিয়ে বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী যাতে লাইসেন্স পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) পাট জন্মানোর লাইসেন্স ফি ও তামাকের ট্যাক্স রহিত করতে হবে।

(গ) সর্বত্র পাকি (৮০ তোলা) ওজনের প্রবর্তন করতে হবে।

৮। (ক).বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহীদানের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে গড়িমসি করা চলবে না- সত্বর নির্মাণ করতে হবে।

(খ) ২১শে ফেব্রুয়ারীকে কাল বিলম্ব না করে সরকারী ছুটি ঘোষণা করতে হবে।

(গ) বর্ধমান হাউসকে অবিলম্বে বাংলা ভাষার গবেষণাগার করতে হবে।

৯। (ক) ভিসা প্রথা রহিত করতে হইবে।

(খ) সর্বহারা মোহাজেরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা চলবে না।

১০। ৯২ (ক) ধারার আবরণে ৯৩ ধারা কার্যকরী করা চলবে না।
বাংলার যে সমস্ত গণপরিষদ সদস্য ৯৩ ধারা, বেংগল রেগুলেশন এ্যাক্ট ও ফ্রন্টিয়ার ক্রাইমস আইন পাশ করতে ভোট দিয়েছেন তারা সমাজের ও গণতন্ত্রের শত্রু- সর্বত্র প্রচার করা হবে।

১১। (ক) পাকিস্তান হবার পর রাস্তাঘাটের অবস্থা অতীব শোচনীয় হয়ে পড়েছে, এর আশু সংস্কার চাই।

www.pathagar.com

(খ) নদী, খাল, বিল ইত্যাদি সংস্কার করে প্রবল বন্যাকে প্রতিরোধ ও সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) মুসলমানদের ওয়াকফ সম্পত্তি ও হিন্দুদের দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি সম্পত্তির আয় জনহিতকর কাজে মোটেই ব্যয় হচ্ছে না, এর প্রতিকার চাই।

১২। মাথাভারী শাসন অর্থাৎ গভর্ণর জেনারেল, গভর্ণর, মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, কমিশনার, হাই কমিশনার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন কম ও পদলোপ করে নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারী ও পুলিশের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে।

১৩। শিক্ষিত বেকার, ভূমিহীন কৃষক-মজুরদের জন্য কাজের ব্যবস্থা চাই। রেল, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও শ্রমিকদের ছাঁটাই ও রিভার্সন বন্ধ করতে হবে।

১৪। বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষার আইন সত্বর কার্যকর করতে ও শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা করতে হবে। মাদ্রাসা ও কলেজ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করতে হবে।

১৫। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম অগ্নিমূল্য হওয়ায় চাষী-মজুরদের ক্রয়ক্ষমতা একেবারেই নাই। অতএব লবণ, কেরোসিন, তেল, নালী, নারিকেল তেল, হলুদ, মসলা ও লাংগলের ফাল, কোদাল, কাঁচি, পাচন ইত্যাদি তৈয়ার করবার জন্য লোহা, জমির সার, কাপড়, তাঁতের সুতা, কর্মকারের কাঁসা, পিতল, করাতির করাত, সুতারের হাতুড়ি, বাটাল, রাদা ইত্যাদি যন্ত্রের এবং মাঝিদের সুতা ও ছাত্রদের পুস্তক, কাগজ-কালির মূল্য কমানোর সত্বর ব্যবস্থা চাই।

১৬। (ক) আখচাষীর আখ খরিদের সুব্যবস্থা ও উপযুক্ত মুল্য চাই।

(খ) তাঁতীদের জন্য বিশেষ সূক্ষ্ম সুতা ও মোটা সুতা আশু সরবরাহের ব্যবস্থা করে তাঁতী সমাজকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করতে হবে।

১৭। মদ, গাঁজা, ভাং, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি হারাম কাজ আইন করে সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।

১৮। মুসলমানগণ যাতে নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত ইত্যাদি সংগত কাজে অবহেলা না করেন সেজন্য এবং অন্য সকল শ্রেণীর নাগরিকদের চরিত্র গঠনের জন্য সরকারী প্রচার (তবলীগ) বিভাগ খুলিতে হইবে। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯। ঘুষ ও স্বজনপ্রীতিতে দেশবাসী অতিষ্ঠ, সত্বর এর স্থায়ী প্রতিকার চাই। শুধু চুনোপুঁটিকে শাস্তি দিলে চলবে না, বড় বড় রুই-কাতলাকেও শাস্তি দিতে হবে।

২০। রেলের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমাতে হবে এবং যাত্রীদের জন্য মোছাফেরখানাও পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে।

২১। সামরিক বিভাগে উচ্চ ও নিম্নপদে উপযুক্ত পরিমাণে বাংগালী গ্রহণ করতে হবে।

২২। গরীব কৃষকদের ঘর-দরজা ও নৌকা নির্মাণের জন্য প্রচুর পরিমাণে শাল কাঠ ও টিন সরবরাহ করতে হবে।

২৩। প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীসংখ্যা ৯ জনের বেশী কিছুতেই রাখা চলবেনা, ডেপুটি মন্ত্রী, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ইত্যাদি ২১-দফার ওয়াদানুায়ী (মাথাভারী শাসন) মোটেই নিযুক্ত করা চলবে না।

২৪। বর্তমানে বন্যার্তদের সাহায্যার্থে যে সমস্ত চাউল, ধান, চিনি ইত্যাদি জিনিষপত্র স্বল্প মূল্যে সরকার সরবরাহ করতেন তাতে সত্যিকারের গরীব জনসাধারণের উপকার হচ্ছে না। বরঞ্চ সরকারের সুষ্ঠু নীতির অভাবে এতে চোরাকারবারী ও মুনাফাখোরীদের বৃটিশ ও মুসলিম আমলের চেয়ে বেশী সুযোগ দেয়া হয়েছে। এ জন্য এর প্রতিকারার্থে বিক্রয়ের নির্দিষ্ট দর বেঁধে সুষ্ঠভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের ৬ দফা

[ফেব্রুয়ারী,১৯৬৬]

*** প্রস্তাব -১ ঃ শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতিঃ**

দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমনি হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। সরকার হবে পার্লামেন্টারী ধরনের। আইন পরিষদের (Legislature) ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

*** প্রস্তাব -২ ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাঃ**

কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল মাত্র দু'টি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে- যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অংগ-রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকবে নিরংকুশ।

*** প্রস্তাব -৩ ঃ মুদ্রা বা অর্থ-সম্বন্ধীয় ক্ষমতাঃ**

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দু'টির যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারেঃ-

(ক) সমগ্র দেশের জন্যে দু'টি পৃথক, অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে।

অথবা

(খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্যে কেবল মাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে করে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক বা অর্থবিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

*** প্রস্তাব -৪ ঃ রাজস্ব, কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতাঃ**

ফেডারেশনের অংগ-রাষ্ট্রগুলির কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অংগ-রাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অংগ-রাষ্ট্রগুলির সবরকমের করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

*** প্রস্তাব -৫ ঃ বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতাঃ**

ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

খ) বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অংগ-রাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন থাকবে।

গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোন হারে অংগ-রাষ্ট্রগুলিই মিটাবে।

ঘ) অংগ-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদি চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোন বাধা-নিষেধ থাকবে না।

ঙ) শাসনতন্ত্রে অংগ-রাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বস্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

*** প্রস্তাব -৬ ঃ আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা ঃ**

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অংগ-রাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

www.pathagar.com

এন,ডি,এফ-এর ৭ দফা

[৩০ এপ্রিল, ১৯৬৬]

১। শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূনর্বিন্যাস সাধন করতে হবে এবং দেশে ফেডারেল পদ্ধতির তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক প্রবর্তন নিশ্চিত করতে হবে। প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত পার্লামেন্টের নিকট সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা পূর্বক পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার চালু করতে হবে। দুই অঞ্চলেরই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন থাকতে হবে এবং দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি (রাজনৈতিক) এবং মুদ্রা (মুদ্রণ) কেন্দ্রের হাতে থাকবে।

২। সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব এই সাবেক প্রদেশগুলির সমবায়ে গঠিত একটি সাব-ফেডারেশন ফেডারেল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হবে। আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে উল্লিখিত সাব-ফেডারেশন এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তান চারটি সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অঞ্চলে পুনগর্ঠিত হতে পারে।

৩। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্বের দরুন দুই অঞ্চলের মধ্যে শ্রম ও মূলধনের বিনিময় একেবারেই অনুপস্থিত, ফলে এক অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যক্রম অন্য অঞ্চলে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনা। সুতরাং পাকিস্তান বস্তুতঃপক্ষে দুই অর্থনৈতিক দেশ যদিও অর্থনীতির প্যাটার্ন একই প্রকার। এই কারণেই দেশের অর্থনীতি ঢালিয়া সাজাইতে হবে।

৪। দশ বৎসরের মধ্যে দুই অঞ্চলের বৈষম্য দূর করতে হবে।

৫। সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশিচত করার লক্ষ্যে জনগণের নিদারুণ দুর্দশার বিনিময়ে গুটি কতকের হাতে বিপুল সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ায় বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে একটি মিশ্র অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করতে হবে; এই মিশ্র অর্থনীতির অধীনে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করবার অধিকার জনগণের থাকবে।

৬। ভারতের সাথে ১৭ দিনের সশস্ত্র যুদ্ধকালীন সময়ে সমস্ত যোগাযোগ বিপর্যস্ত হয়া যাওয়ায় পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিমাঞ্চল হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়া পড়ে। দেশরক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীলতার তত্ত্ব কার্যকর নয়, সুতরাং প্রতিটি অঞ্চলের দেশরক্ষা স্থানীয় সম্পদের উপর ভিত্তি করে সেই অঞ্চলেই সম্পূর্ণভাবে গড়ে তুলতে হবে।

৭। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি স্বাধীন হতে হবে। কোন বৃহৎ শক্তি শিবিরের প্রতি এই নীতির কোন পক্ষপাত থাকবে না। কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব এই নীতির উপর ভিত্তি করে অধিকতর বিচক্ষণতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে আমাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হতে হবে। বিদেশী রাষ্ট্র এবং আমাদের মধ্যে সকল ভুল বুঝাবুঝি দুর করিতে হবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের দৃঢ় সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

www.pathagar.com

ন্যাপের ১৪ দফা

[৪-৭ জুন, ১৯৬৬]

১। বর্তমান আইন পরিষদগুলি ভেঙ্গে দিয়ে প্রত্যক্ষ ও প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নূতন আইন পরিষদ নির্বাচন করতে হবে এবং অনুরূপভাবে নির্বাচিত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নিম্নোদ্ধৃত বিষয়গুলির ব্যবস্থা করার জন্য শাসনতন্ত্র সংশোধন করবেনঃ

(ক) ফেডারেল শাসন ব্যবস্থার অধীনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের পূর্ণ স্বায়ত্তশসনের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান।

পাকিস্তানের উভয় অংশকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান কেবলমাত্র দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রা এই তিনটি বিষয়ের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে। অন্যান্য সকল বিষয়ের দায়িত্ব পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে।

(খ) সংস্কৃতি ও ভাষার সমতা এবং ভৌগোলিক সংলগ্নতার ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ হিসাবে পুনর্গঠন।

পশ্চিম পাকিস্তানের পুনর্গঠিত প্রদেশসমূহের গণতান্ত্রিক গঠন কাঠামো একইরূপ হবে এবং তারা (প্রদেশসমূহ) একটি আঞ্চলিক ফেডারেশনে ঐক্যবদ্ধ হবে। এই ফেডারেশনের আইন পরিষদে কোন প্রদেশই নিজের সংখ্যাধিক্যের বলে একত্রে অবশিষ্ট প্রদেশসমূহ অপেক্ষা বেশী সংখ্যক আসনের অধিকারী হতে পারবে না এবং প্রদেশসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যে সকল বিষয়ে একমত হবেন, পরিষদ সেই সকল সাধারণ বিষয় কার্যকর করিবে। একটি আঞ্চলিক ফেডারেশনের দ্বারা বর্তমান এক-ইউনিট ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার উপরোক্ত লক্ষ্য শাসনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে অর্জন করা হবে। বর্তমান উপজাতীয় এলাকা, দেশীয় রাজ্য, ইজারাধীন এলাকা, এজেন্সীসমূহ ও অনুরূপভাবে শাসিত এলাকাগুলিসহ সমস্ত বিশেষ ও সাধারণ আওতা বহির্ভূত এলাকাসমূহকে সন্নিহিত প্রদেশগুলির সহিত অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে যুক্ত করতে হবে। যাযাবর, আধা-যাযাবর ও উপজাতীয় জনসাধারণকে বৃহত্তর জীবনের সহিত সম্পৃক্ত করতে হবে যাতে তারা উন্নত নাগরিক জীবনের সুযোগ-সুবিধাদি ভোগ করিতে পারে।

সকল পাকিস্তানীর মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব বোধের বিকাশকে উৎসাহিত ও শক্তিশালী করতে হবে। সামাজিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক বিনিময়কে উৎসাহিত করতে হবে এবং উভয়াঞ্চলীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও স্বল্পব্যয়সাধ্য করতে হবে।

(গ) পরিষদগুলিকে আইন ও বাজেট পাশের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করতে হবে এবং প্রেসিডেন্ট ও গভর্ণরগণের আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা রহিত করতে হবে।

(ঘ) জনগণকে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা দিতে হবে এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৪৮ সালে গৃহীত মানবাধিকার সনদে স্বীকৃত সকল অধিকার ভোগ করতে দিতে হবে।

২। পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ঘোষিত জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে। সকল দমনমূলক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

www.pathagar.com

৩। প্রিন্স করিম, আবদুস সামাদ খান আচাকযাই, আতাউল্লাহ খান মেংগল, মনিকৃষ্ণ সেন, আব্দুল হালিমসহ রাজনৈতিক কারণে সাজাপ্রাপ্ত ও বিনা বিচারে আটক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল বন্দীকে আশু মুক্তি দিতে হইবে। রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে সকল বিচারাধীন মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করতে হবে এবং রাজনৈতিক কারণে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ও জরিমানা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

৪। পাকিস্তানকে 'সিয়াটো' ও 'সেন্টো' হতে সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে হবে। পাকিস্তানে সকল মার্কিন ঘাঁটির বিলোপ সাধন করতে হবে এবং এই ধরণের আর কোন চুক্তিতে জড়িত হওয়া চলবে না।

৫। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা কাঠামোকে পুনর্গঠন করতে হবে। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে। নৌ বাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করতে হবে।

৬। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও শিল্প সংক্রান্ত নীতির প্রধান লক্ষ্য হবে এখানকার জনসাধারণের কল্যাণ সাধন। পূর্ব পাকিস্তান হতে পুঁজি পাচার বন্ধ করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তান বা পশ্চিম পাকিস্তান যেখানেই হউক না কেন, জনসাধারণকে শোষণের এবং গুটিকয়েক পরিবার কর্তৃক দেশের সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত করার চেষ্টাকে বন্ধ করতে হবে। সকল গুরুত্বপূর্ণ ও মূল শিল্পগুলি সরকারী খাতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৭। দেশরক্ষা শিল্প সরকারী খাতে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং উহা দেশের উভয়াংশে স্থাপন করতে হবে।

৮। আমলাতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি এবং ব্যাংক, বীমা কোম্পানী ও পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ করতে হবে।

৯। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির পরিমাণ পূর্ব পাকিস্তানে ৩৩ একর ও পশ্চিম পাকিস্তানে ১০০ একরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। সরকারের খাস জমির মঞ্জুরী অথবা হস্তান্তর শ্রমজীবী কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে ৫ একর পর্যন্ত এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১২ একর পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করতে হবে। সামরিক শাসনামলে বর্ধিত খাজনা, ট্যাক্স প্রত্যাহার করতে হবে।

১০। শ্রমিক সংগঠনের উপর বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করতে হবে এবং আই,এল,ও, কনভেনশন যে সকল অধিকার স্বীকার করা হয়েছে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। জীবন ধারণের ন্যূনতম মজুরীর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

১১। সকল স্তরে সকলের নিকট মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে। হামদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করে একটি নূতন গণতান্ত্রিক কমিশন নিয়োগ করতে হবে।

১২। বেলুচিস্তানে নির্যাতনের অবসান ঘটাতে হবে এবং সর্দারী প্রথা বাতিল করতে হবে।

১৩। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা প্রতিরোধ করবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

পি,ডি,এম-এর ৮ দফা

[৩০ এপ্রিল, ১৯৬৭]

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন
গণতন্ত্র ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে
৮ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে
৫টি বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন

পিডি এম-এর অংগদলসমূহঃ

* পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
* পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)
* জামায়াতে ইসলামী, পাকিস্তান
* পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টি
* জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ)

৮-দফা কর্মসূচী

(এক)

শাসনতন্ত্রে নিম্ন-বিধানসমূহের ব্যবস্থা থাকবে ঃ

(ক) পার্লামেন্টারী পদ্ধতির ফেডারেল সরকার,
(খ) ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র মোতাবেক প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রাধান্য,
(গ) পূর্ণাংগ মৌলিক অধিকার,
(ঘ) সংবাদপত্রের অবাধ আযাদী ও
(ঙ) বিচার বিভাগের নিশ্চিত স্বাধীনতা।

(দুই)

ফেডারেল সরকার নিম্ন বিষয়সমূহের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করবেনঃ

(ক) প্রতিরক্ষা (ডিফেন্স)
(খ) বৈদেশিক বিষয়
(গ) মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা
(ঘ) আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য এবং ঐক্যমতে নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।

(তিন)

পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা হবে এবং কেন্দ্রীয় বিষয় ছাড়া সরকারের অবশিষ্ট যাবতীয় ক্ষমতা শাসনতন্ত্র মোতাবেক স্থাপিত উভয় আঞ্চলিক সরকারের নিকটই ন্যস্ত থাকবে।

(চার)

উভয় প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দশ বৎসরের মধ্যে দূর করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবেঃ

(ক) এই সময়ের মধ্যে দেশরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ে ব্যয় এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

www.pathagar.com

বৈদেশিক ঋণসহ কেন্দ্রীয় সরকারের দেনায় পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত অর্থের আনুপাতিক অংশ আদায়ের পর পূর্ব পাকিস্তানে অর্জিত সম্পূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রা নিরংকুশভাবে এই প্রদেশেই ব্যয় করা হবে,

(খ) দুই অঞ্চলের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রাদেশিক সরকারদ্বয়ের নিরংকুশ কর্তৃত্বাধীনেই থাকবে,

(গ) অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার প্রদান করবেন যাতে, পূর্ব পাকিস্তান হতে মূলধন পাচার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংকের মওজুদ অর্থ ও মুনাফা, বীমার প্রিমিয়াম এবং শিল্পের মুনাফা সম্পর্কে যথাসময়ে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হবে।

(পাঁচ)

(ক) মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং,

(খ) আন্তঃ আঞ্চলিক বাণিজ্য,

(গ) আন্তঃ আঞ্চলিক যোগাযোগ,

(ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের প্রত্যেকটি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত এক একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। জাতীয় পরিষদের প্রত্যেক প্রদেশের সদস্যগণ নিজ প্রদেশের জন্য উক্ত বোর্ডসমূহের সদস্যগণকে নির্বাচন করবেন।

(ছয়)

সুপ্রীম কোর্ট এবং কূটনৈতিক বিভাগসহ কেন্দ্রীয় সরকারের সকল বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হবে। এই সংখ্যাসাম্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে এমনভাবে কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে, যাহাতে দশ বৎসরের মধ্যে তাদের সংখ্যা উভয় প্রদেশে সমান হতে পারে।

(সাত)

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কার্যকর সামরিক শক্তি ও সমর-সজ্জার ব্যাপারে উভয় অঞ্চলের মধ্যে সমতা বিধান করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে। এই উদ্দেশ্যেঃ

ক) পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক একাডেমী, অস্ত্র-নির্মাণ কারখানা, ক্যাডেট কলেজ ও স্কুল স্থাপন করতে হবে।

খ) দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি বিভাগেই পূর্ব পাকিস্তান হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়োগ করতে হবে।

গ) নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করতে হবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য সম্বলিত একটি ডিফেন্স-কাউন্সিল গঠন করা হবে।

(আট)

এই ঘোষণায় 'শাসনতন্ত্র' শব্দ দ্বারা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বুঝায়-যা অবিলম্বে জারী করা হবে। এই শাসনতন্ত্র চালু করবার ছয় মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই এই কর্মসূচীর দুই হতে সাত নম্বর দফাসমূকে শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করা হবে।

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত সকল রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠান ঐক্যবদ্ধ এবং পৃথক পৃথকভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

www.pathagar.com

সি-পি-ই-পি (এম-এল) -এর ৮ দফা

[১৯৬৭]

১। সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী মুৎসুদ্দি আমলা (বড় বুর্জোয়া) পরিচালিত স্বৈরাচারী এককেন্দ্রীক ধনবাদী-সামন্তবাদী রাষ্ট্রের কবল হতে পূর্ব বাংলাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা এবং পূর্ব বাংলায় এক স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করা।

এই রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কাজ হবেঃ

পূর্ব বাংলার আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করা। পূর্ব বাংলার বুক হতে সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী ও উহাদের সহযোগী পুঁজির শোষণ সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা, জাতিগত নিপীড়নের সম্পূর্ণ অবসান করা এবং এই শোষণ ও নিপীড়নের স্বার্থ রক্ষাকারী বর্তমান স্বৈরাচারী রাষ্ট্রযন্ত্র, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে এর স্থলে জনগণের রাষ্ট্রযন্ত্র, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করা।

এই রাষ্ট্রে জনগণের শত্রু সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং তাদের সহযোগী বুর্জোয়াদের কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার থাকবে না। তাই মুষ্টিমেয় প্রতিক্রিয়াশীল শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চলবে জনগণের একনায়কত্বমূলক শাসন।

পক্ষান্তরে এই তিন শত্রুর বিরোধী প্রত্যেক শ্রেণী ও ব্যক্তির, অর্থাৎ দেশের শতকরা ৯৯ জন লোকের থাকবে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার। তাদেরই থাকবে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার, ভোটাধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংঘ গঠনের স্বাধীনতা।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রকে-আমলা, পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিচার বিভাগ এবং প্রতিটি গণ-বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসন-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবে এবং উহার স্থলে স্থাপন করা হবে প্রতিটি ক্ষেত্রে জনগণের কর্তৃত্ব, জনগণের গণতান্ত্রিক শাসন।

২। এই রাষ্ট্র সকল সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী বুর্জোয়াদের পুঁজি বাজেয়াপ্ত করবে এবং সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করবে। পূর্ব বাংলার সমস্ত বড় বড় শিল্প, ব্যাংক বীমা কোম্পানী, আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য, বিদ্যুৎ ও পানি ডাক, তার, পরিবহন শিল্প এবং পাট ও খাদ্য ব্যবসা জাতীয়করণ করবে। শিল্প, ব্যবসা, ব্যাংক প্রভৃতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়াত্ত অংশই হবে নিয়ন্ত্রণকারী ও আধিপত্যশীল। জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমর্থক ছোট ও মাঝারী বুর্জোয়াদের শহর ও গ্রামাঞ্চলে শিল্প-ব্যবসার ক্ষেত্রে সুযোগ-প্রদানের সাথে সাথে লক্ষ্য রাখা হবে যাতে তারা জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসৃত রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ ও জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কিছু না করেন। তাদের মুনাফা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। এই রাষ্ট্র ধনবাদের বিকাশে বাধা দিবে এবং গোটা দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ যাতে সমাজতন্ত্রে অগ্রসর হওয়ার পথ প্রশস্ত করে সেই প্রচেষ্টা চালাবে।

৩। এই রাষ্ট্র সকল সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করবে। খাজনা প্রথার বিলুপ্তি সাধন করবে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরোধী সমস্ত ভূস্বামীদের জমি ও চাষের যন্ত্রপাতি দখল করে তা বিনামূল্যে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে বিলি

www.pathagar.com

করবে। কৃষকদের জীবনধারণের মানের উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা গোটা দেশের ও সমস্ত জনগণের স্বার্থে আধুনিক যান্ত্রিক চাষ ও যৌথ সমবায় প্রথা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করবে। কৃষকেরা যাতে স্বেচ্ছামূলকভাবেই এই পথ গ্রহণ করে সে জন্য তাদিগকে উৎসাহিত, সচেতন ও সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদান করবে। ক্ষেতমজুর, গরীব ও মাঝারী কৃষক এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তদের সমস্ত বকেয়া ঋণ ও খাজনা মওকুফ করা হবে। বন্যানিয়ন্ত্রণ এবং উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা করা হবে।

৪। এই রাষ্ট্র প্রত্যেক লোকের জীবিকা, খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির জন্য কাজ, বাঁচার উপযোগী মজুরী এবং জীবনধারণের মান ক্রমাগত উন্নতির ব্যবস্থা করবে। প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে কাজ করতে হবে। রুগ্ন, বৃদ্ধ ও কাজে অক্ষম ব্যক্তিদের ভরণপোষণের ও জীবনধারণের নিরাপত্তার ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করবে। পূর্ব বাংলার বুক হতে ঘুষ দুর্নীতি, বেকারী, ভিক্ষাবৃত্তি, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি বিলোপের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫। এই রাষ্ট্রে নারী-পুরুষ, সম্প্রদায়, জাতিসত্ত্বা ও ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক মেহনতী ব্যক্তির থাকবে সমান অধিকার। প্রত্যেক নাগরিকের নিজ বিবেক অনুযায়ী ধর্ম পালন করবার থাকবে স্বাধীনতা। রাষ্ট্র হবে ধর্ম-নিরপেক্ষ।

৬। এই রাষ্ট্র পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরস্থ উপজাতি সমূহের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে সকল উপায়ে সাহায্য করবে। পূর্ব বাংলার বাংগালী জাতির ন্যায় তাদেরও থাকবে সমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার। পূর্ব বাংলার অধিবাসী অবাংগালী মেহনতী জনগণও বাংগালী জাতির ন্যায় সমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগ করবে।

এই রাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম পূর্ণ সমর্থন ও সাহায্য প্রদান করবে।

৭। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই রাষ্ট্রের মূলনীতি হবে বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন করা এবং পূর্ব বাংলার বুক হতে নিরক্ষরতার অভিশাপ সম্পূর্ণ দূর করা। প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। দেশের সর্বাংগীন উন্নতির স্বার্থে আধুনিক শিল্প, আধুনিক কৃষি, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও কারিগরীর উপযোগী ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী, সাম্প্রদায়িক ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতির উচ্ছেদ সাধন করে প্রগতিশীল; সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-পুঁজিবাদ বিরোধী অসাম্প্রদায়িক জনগণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারার প্রচারের অবাধ সুযোগ প্রদান এবং সমাজতন্ত্র ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদে জনগণকে শিক্ষিত করা।

৮। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এই রাষ্ট্রের মূলনীতি হবেঃ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা। জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও শান্তির জন্য সংগ্রামরত জনগণ ও রাষ্ট্রের সপক্ষে দাঁড়ানো। তাদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করা। তাদের সংগ্রামে সমর্থন ও সাহায্য করা। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতা, আমাদের প্রতিবেশী এবং আমাদের দেশের জনগণের অকৃত্রিম বন্ধু গণচীনের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা।

www.pathagar.com

ডাক-এর ৮-দফা

[৮ জানুয়ারী, ১৯৬৯]

১। ফেডারেল প্রকৃতির পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম,
২। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন,
৩। অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার,
৪। পূর্ণ নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সমস্ত্র কালাকানুন বিশেষ করে বিনা বিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল,
৫। খান আবদুল ওয়ালী খান, শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দী, রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত সব গ্রেফতার পরোয়ানা প্রত্যাহার,
৬। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারার আওতায় জারীকৃত সকল নির্দেশ প্রত্যাহার,
৭। শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা,
৮। নতুন ডিক্লারেশন দানের উপর আরোপিত বিধিনিষেধসহ সংবাদপত্রের উপর জারীকৃত সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ইত্তেফাক, চাটান, প্রগ্রেসিভ পেপারস লিমিটেডসহ সকল বাজেয়াপ্তকৃত কিংবা ডিক্লারেশন বাতিলকৃত প্রেস পত্রিকা এবং সাময়িকী তাদের আদি মালিকের কাছে প্রত্যাবর্তনের দাবী করছেন।

সংগ্রামী ছাত্র সমাজের-১১-দফা

[১৪ জানুয়ারী, ১৯৬৯]

১। (ক) সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করতে হবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকীকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে।
(খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করতে হবে এবং বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল- কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হবে। কারিগরী শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়েল ইনষ্টিটিউট স্থাপন করতে হবে।
(গ) প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ আই, এ, আই, এসসি, আই, কম ও বি,এ,বি, এসসি, বি, কম, এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ এম, এ ও এম,কম ক্লাস চালু করতে হবে।
(ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করতে হবে। স্কলারশীপ ও ষ্টাইপেন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে স্কলারশীপ ও ষ্টাইপেন্ড কেড়ে নেয়া চলবে না।
(ঙ) হল, হোষ্টেলের ডাইনিং হল ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসাবে প্রদান করতে হবে।
(চ) হল ও হোষ্টেল সমস্যার সমাধান করতে হবে।
(ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। অফিস আদালতে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হবে।

www.pathagar.com

(জ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করতে হবে।

(ঝ) মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাংগ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিকেল ছাত্রদের দাবী মেনে নিতে হবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবী মেনে নিতে হবে।

(ঞ) প্রকৌশল শিক্ষার অটোমোশন প্রথা বিলোপ, ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষবর্ষেও ক্লাস দেয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবী মেনে নিতে হবে।

(ট) পলিটেকনিক ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' সুযোগ দিতে হবে এবং বোর্ড ফাইনালে পরীক্ষা বাতিল করে একমাত্র সেমিষ্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হবে।

(ঠ) টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার, টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবী অবিলম্বে মেনে নিতে হবে। আই, ই, আর, ছাত্রদের দশ-দফা, সমাজ কল্যাণ কলেজ ছাত্রদের, এম,বি,এ, ছাত্রদের ও আইনের ছাত্রদের সমস্ত দাবী মেনে নিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে আলাদা "ফ্যাকাল্টি" করতে হবে।

(ড) কৃষি বিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবী মেনে নিতে হবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' দাবীসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবী মেনে নিতে হবে।

(ঢ) ট্রেনে, ষ্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কন্সেসনে' টিকেট দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মাসিক টিকিটেও এই 'কন্সেসন' দিতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মত বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোন স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। দূরবর্তী অঞ্চলে বাস যাতায়াতেও শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে হবে। ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারী ও আধা-সরকারী উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে হবে।

(ণ) চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

(ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

(থ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল করতে এবং ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।

২। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে। দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

৩। নিম্নলিখিত দাবীসমূহ মেনে নেয়ার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবেঃ

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি

www.pathagar.com

বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অংগ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হবে নিরংকুশ।

(গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যে, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। দুই অঞ্চলে দু'টি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করতে হবে।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে, ফেডারেল সরকারের কোন কর ধার্য করবার ক্ষমতা থাকবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সংগে সংগে ফেডারেল তহবিলে জমা হবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহিবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করবে এবং বহিবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অংগ রাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন থাকবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অংগ রাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অংগ রাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অংগ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানী-রপ্তানী চলবে এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রপ্তানী করবার অধিকার অংগ রাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করে শাসনতন্ত্রে বিধান করতে হবে।

(চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী রক্ষা বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌ বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করতে হবে।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতঃ সাব-ফেডারেশন গঠন করতে হবে।

৫। ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করতে হবে।

৬। কৃষকের উপর হতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করতে হবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করতে হবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহসিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণপ্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে।

শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস দিতে হবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করতে হবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করতে হবে।

৭। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস দিতে হবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করতে হবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করতে হবে।

৮। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

www.pathagar.com

১০। সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করে জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করতে হবে।

১১। দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

শেখ মুজিবের ৫ দফা

[৭ মার্চ, ১৯৭১]

(১) অবিলম্বে সামরিক বাহিনীর সকল লোককে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া।

(২) বেসামরিক লোকের উপর গুলীবর্ষণ অবিলম্বে বন্ধ করা। যাতে এরপর আর একটিও গুলী বর্ষিত না হয়।

(৩) সামরিক প্রস্তুতি অবিলম্বে বন্ধ করা। পশ্চিম খন্ড হতে সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যাপক আমদানী অবিলম্বে বন্ধ করা।

(৪) বাংলাদেশের সরকারের বিভিন্ন বিভাগে সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ না করা। সরকারী অফিসার ও কর্মচারীদের হয়রানি বন্ধের নির্দেশ দান।

(৫) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ সম্পূর্ণরূপে পুলিশ, বাংগালী ইপিআর বাহিনীর উপর ন্যস্ত করা, প্রয়োজনবোধে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তাদের সহায়তা করতে পারে।

ভাসানী ন্যাপের ১১ দফা

[৯-১০ ডিসেম্বর, ১৯৭২]

১। অবিলম্বে রাজনৈতিক হত্যা, অপহরণ, গুন্ডামি, হামলা বন্ধকরণ।

২। মিথ্যা মামলায় আটক সকল রাজনৈতিক কর্মীর মুক্তি দান ও এই সকল মামলা প্রত্যাহার।

৩। দালালী আইনের অপপ্রয়োগ বন্ধ করার জন্য দালালের সংজ্ঞা নির্ধারণ, অবিলম্বে দালালীর দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকা প্রদান, উক্ত তালিকার সময়সীমা নির্ধারণ ও নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ফৌজদারী আইনের আওতায় প্রকৃত দালালদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে দালাল আইন প্রত্যাহার।

৪। প্রেসিডেন্ট অর্ডার ৫০ বাতিল ঘোষণাকরণ।

৫। আইয়ুবী প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স বাতিল করিয়া 'হককথা', 'মুখপত্র', 'গণশক্তি', 'স্পোকসম্যান' ও 'লাল পতাকা' সহ নিষিদ্ধকৃত সংবাদপত্রসমূহের পুনঃ প্রকাশের ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের অবিলম্বে অনুমতি দান।

৬। লালবাহিনী, স্বোচ্ছাসেবক বাহিনীসহ বিভিন্ন বেসরকারী বাহিনী নিষিদ্ধকরণ এবং হত্যা, অপরহরণ ও হয়রানীর ব্যাপারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও শাস্তিদান।

৭। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবর্গসহ সরকারী দলের কর্মকর্তাদের সরকারী খরচে সরকারী যানবাহনের সুযোগ গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধকরণ।

৮। সরকারী প্রচার মাধ্যমে যথা রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদপত্রসমূহ, টেলিভিশনে বিরোধী দলীয় বক্তব্য প্রচারের সুযোগ প্রদান।

www.pathagar.com

৯। রিলিফদ্রব্য বন্টনের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা ও বিদেশী সাহায্য সংস্থা কর্তৃক রিলিফ বন্টনের নামে বিরোধীদলীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রচারণা বন্ধকরণ।
১০। নির্বাচনের পূর্বে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ এবং
১১। ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য পুনরায় সময় ও সুযোগ প্রদান।

** সূত্রঃ সৈয়দ আবুল মকসুদ, 'ভাসানী', প্রথম খন্ড, পৃ-৪৬৮-৬৯*

মওলানা ভাসানীর ৩ দফা

[১৪ মে ১৯৭৩]

১। খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করতে হবে।
২। দমননীতি বন্ধ করতে হবে।
৩। শিল্প, ব্যবসা, চাকুরী ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে অরাজকতার অবসান এবং জানমালের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

** সূত্রঃ মুদ্রিত প্রচারপত্র।*

সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্টের ৪ দফা

[১৪ এপ্রিল, ১৯৭৪]

১। (ক) সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি, রাজনৈতিক কারণে হুলিয়া, গ্রেফতার, পরোয়ানা ও মিথ্যা রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার।
   (খ) বিশেষ ক্ষমতা আইন, রক্ষী বাহিনী আইন, রাষ্ট্রপতির ৮ ও ৯ নং আদেশ, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা দমন আইন বাতিল।
২। (ক) রক্ষী বাহিনী বাতিল করে উপযুক্তভাবে তাদের পুনর্বাসনকরণ।
   (খ) দেশের বর্তমান আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন ও সকল নাগরিকের জানমাল ও ইজ্জতের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান।
৩। (ক) গ্রাম ও শহরের সর্বত্র খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রয়োজনীয় রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনয়ন।
   (খ) সকল প্রকার দুর্নীতি, চোরাচালান, মুনাফাখোরী, লাইসেন্স-পারমিটবাজি দমন, অসদুপায়ে অর্জিত বা বে-আইনীভাবে দখলকৃত ধন সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধান।
৪। বাংলাদেশের শিল্প ব্যবসাসহ সামগ্রিক অর্থনীতিকে বিদেশী আগ্রাসন ও আধিপত্য থেকে মুক্তকরণ এবং জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী সকল বৈদেশিক চুক্তি বিশেষ করে ভারতের সাথে সকল গোপন ও অসম চুক্তি বাতিলকরণ।

** মওলানা ভাসানীকে চেয়ারম্যান করে 'সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্ট' গঠিত হয় ১৯৭৪ সালের ১৪ এপ্রিল।*

*** সূত্রঃ অলি আহাদঃ 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫' পৃ-৫৫-৫৭*

www.pathagar.com

ইয়াহিয়া-মুজিব সমঝোতার ৪ দফা

[১৬-২৩ মার্চ, ১৯৭১]

('৭১ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ থেকে অনুষ্ঠেয় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। প্রতিবাদে বাংলাদেশের সর্বত্র স্বাধীনতার দাবি উচ্চারিত হতে থাকে। জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান 'শান্তিপূর্ণ ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন' পরিচালনার আহবান জানান এবং প্রবল জনমতের চাপে ৭ মার্চের জনসমাবেশে তাকে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ও উচ্চারণ করতে হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সংগে ১৬ মার্চ থেকে অনুষ্ঠিত আলোচনাকালে শেখ মুজিব স্বাধীনতার বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন এবং নিম্নোক্ত ৪-দফা সমঝোতায় সম্মত হন। এই ৪ দফার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম প্রকাশ করেন মুজিবনগরে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ। '৭১ সালের ১৭ এপ্রিল 'টু দ্য পিপল অব দ্য ওয়ার্ল্ড' শিরোনামে প্রচারিত তাজউদ্দিন আহমদের। একটি বিবৃতি থেকে নিচের ৪-দফা সংগৃহীত হয়েছে।)

১। সামরিক শাসনের প্রত্যাহার এবং প্রেসিডেন্টের ঘোষণাবলে বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।

২। বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।

৩। ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকবেন এবং কেন্দ্রিয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করবেন।

৪। প্রথমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্যরা পৃথক পৃথক অধিবেশনে মিলিত হবেন এবং তারপর দু'প্রদেশের সদস্যদের যৌথ অধিবেশনে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র চূড়ান্ত করা হবে।

** সূত্রঃ 'বাংলাদেশের স্বাধনিতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র', তৃতীয় খন্ড, পৃ-২৫-৩২।*

বাকশাল-এর ৪ দফা

[২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫]

(১) জাতীয় ঐক্য,
(২) দুর্নীতি দমন,
(৩) উৎপাদন বৃদ্ধি,
(৪) জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ।

** সূত্রঃ বাকশালের গঠনতন্ত্র, ১৯৭৫*

জিয়ার ১৯ দফা

[এপ্রিল, ১৯৭৭]

১। সর্বতোভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।

২। শাসনতন্ত্রের চারটি মূলনীতি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলিত করা।

www.pathagar.com

৩। সর্ব উপায়ে নিজেদেরকে একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসাবে গড়ে তোলা।
৪। প্রশাসনের সর্বস্তরে উন্নয়ন কার্যক্রমে এবং আইন-শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৫। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ তথা জাতীয় অর্থনীতিকে জোরদার করা।
৬। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং কেউ যেন ভূখা না থাকে, তার ব্যবস্থা করা।
৭। দেশে কাপড়ের উৎপাদন বাড়িয়ে সকলের জন্য অন্ততঃ মোটা কাপড় সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৮। কোন নাগরিক যেন গৃহহীন না থাকে, তার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা।
৯। দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
১০। সকল দেশবাসীর জন্য ন্যূনতম চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা।
১১। সমাজে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং যুব সমাজকে সুসংহত করে জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা।
১২। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারী খাতে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দান।
১৩। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে সুস্থ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।
১৪। সরকারী চাকুরিজীবীদের মধ্যে জনসেবা ও দেশ গঠনের মনোবৃত্তি উৎসাহিত করা এবং তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়ন করা।
১৫। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা।
১৬। সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক বিশেষ জোরদার করা।
১৭। প্রশাসন এবং উন্নয়ন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা।
১৮। দুর্নীতিমুক্ত ন্যায়নীতিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা করা।
১৯। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার পূর্ণ সংরক্ষণ করা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা।

** সূত্রঃ মুদ্রিত প্রচারপত্র।*

জামায়াতে ইসলামীর ৭ দফা

[৩০ জানুয়ারী ১৯৮১]

ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবী

১। বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে হবেঃ
(ক) আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিতে হবে।
(খ) কোরআন ও সুন্নাহর আইন জারী করতে হবে।
(গ) প্রচলিত আইনকে কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে।
(ঘ) মুসলিম অমুসলিম সকলের প্রতি ইনসাফ ও সুবিচার করতে হবে।

২। ঈমানদার যোগ্য লোকের সরকার কায়েম করতে হবেঃ
(ক) খোদাবিমুখ ও অসৎ লোকদের নেতৃত্ব খতম করতে হবে।
(খ) সৎ ও যোগ্য লোকদেরকে শাসন ক্ষমতা দিতে হবে।
(গ) পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে হবে।

www.pathagar.com

৩। **বাংলাদেশের আযাদীর হেফাজত করতে হবেঃ**
(ক) জনমনে জাতীয়তার ইসলামী চেতনা জাগাতে হবে।
(খ) রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রসম্মত বানাতে হবে।
(গ) মৌলিক মানবাধিকার বহাল করতে হবে।
(ঘ) যাবতীয় অসম চুক্তি বাতিল করে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে হবে।
(ঙ) মুসলিম জাহানের ঐক্য প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।

৪। **আইন ও শৃংখলা পূর্ণরূপে বহাল করতে হবেঃ**
(ক) জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করতে হবে।
(খ) সমাজবিরোধী যাবতীয় কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।
(গ) বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করতে হবে।

৫। **ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু করতে হবেঃ**
(ক) সরকারকে ভাত-কাপড় বাসস্থানসহ মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব নিতে হবে।
(খ) জনশক্তিকে দক্ষ বানিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে।
(গ) মেহনতী মানুষের ন্যায্য অধিকার দিতে হবে।
(ঘ) পরিবার পরিকল্পনার নামে ঈমান ও চরিত্র ধ্বংসী জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে।

৬। **ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রবর্তন করতে হবেঃ**
(ক) সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।
(খ) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় স্থাপন করতে হবে।
(গ) মাদ্রাসা শিক্ষার যথার্থ মর্যাদা দিতে হবে।
(ঘ) শুক্রবারকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করতে হবে।
(ঙ) অপসংস্কৃতি বন্ধ করে ইসলামী সংস্কৃতি চালু করতে হবে।

৭। **কোরআন হাদীস মোতাবেক মহিলাদের যাবতীয় অধিকার বহাল করতে হবেঃ**
(ক) মহিলাদেরকে ইসলামসম্মত মর্যাদা দিতে হবে।
(খ) মহিলাদের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে।
(গ) মহিলাদের পৃথক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
(ঘ) মহিলাদের নৈতিক অধঃপতনের ষড়যন্ত্র রোধ করতে হবে।

** সূত্রঃ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশিত (পুস্তিকা) 'ইসলামী বিপ্লবের ৭-দফা গণদাবী' সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩।*

সহায়ক গ্রন্থঃ ২১-দফা থেকে ৫-দফা, আব্দুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমদ রেজা।

www.pathagar.com

এরশাদের ১৮দফা

[১৭ মার্চ, ১৯৮৩]

মূল দর্শন

১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা
২। ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধ
৩। ভাষা ও সংস্কৃতি
৪। জাতীয় সংহতি

মৌলিক চাহিদা

৫। অন্ন-বস্ত্র
৬। বাসস্থান
৭। শিক্ষা
৮। স্বাস্থ্য
৯। কর্মসংস্থান

গ্রামীণ অর্থনীতি

১০। কৃষি উৎপাদন
১১। ভূমি সংস্কার

শিল্প ও শ্রমিক নীতি

১২। জাতীয় আয়ের সুষম বন্টন

উন্নত সামাজিক পরিবেশ

১৩। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ
১৪। নারী সমাজের উন্নয়ন
১৫। দুর্নীতি প্রতিরোধ

গণতন্ত্রে উত্তরণের নীতি

১৬। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ
১৭। বিচারব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস
১৮। জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি

বিঃদ্রঃ শুধুমাত্র ১৯৭১ থেকে ৮৩ পর্যন্ত প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন দফাগুলো এখানে সংযোজিত হলো।

www.pathagar.com

স্বাদেশিকতায় উজ্জীবিত জনগণের কাছে প্রশ্ন

- নব্য জগৎশেঠ ও ক্লাইভরা এদেশীয় মীরজাফরদের সহায়তায় বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত করার অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। গত ত্রিশ বছরের বিভিন্ন চুক্তি, চিন্তা চেতনা, কর্মে ও কথায় এর সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। আপনি কি এই নব্য মীরজাফরদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি চান ?
- বিগত সরকারগুলো (বৃটিশ প্রণীত মোনাফেকী মার্কা গণতন্ত্র) গণতন্ত্রের নামে বিভ্রান্তিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করেছে। আপনি কি গণতন্ত্রের সুস্থ বিকাশ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সার্বিক প্রতিষ্ঠা চান?
- আপনি কি সর্বস্তরে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চান?
- ইসলাম একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম। যারা ইসলামকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার অপচেষ্টা করছে আপনি কি এই অশুভ চক্রান্ত প্রতিহত করে এদেশে ঐতিহ্যবাহী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে চান?
- সাহায্যের নামে বিদেশী এনজিওগুলো এদেশকে দ্বিতীয় লেবানন বানানোর পাঁয়তারা করছে। আপনি কি এদের খপ্পর হতে ৯০% মুসলমানকে রক্ষা করতে চান?
- আপনি কি সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন এবং আপনার সন্তানকে দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৈষয়িক শিক্ষার সাথে নৈতিক শিক্ষা চালু করতে আগ্রহী? আপনি কি বৃটিশ শাসকদের তৈরী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন চান?
- অবিবেচক রাজনৈতিক নেতারা তাদের সন্তানদের নিরাপদে বিদেশের মাটিতে লেখাপড়ার সুযোগ করে দিয়ে আমাদের সন্তানদেরকে উপরে উঠার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করে বলির পাঁঠা বানিয়ে শিক্ষাঙ্গনকে রণাঙ্গনে পরিণত করেছে এবং আমাদের সন্তানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলা খেলছে। আপনি কি এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চান?
- নৈতিক শিক্ষা তুলে দিয়ে মানব রচিত বিভিন্ন চটকদার ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করে এবং ছাত্রদের হাতে অস্ত্র, অবৈধ অর্থ ও মাদকদ্রব্য তুলে দিয়ে তাদের চরিত্রকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আপনি কি এই হাজার হাজার প্রতিভাবান ছাত্রদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে চান?

www.pathagar.com

- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্র এ দেশের শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস করে আমাদের দেশের প্রতিভাবান ছেলেদেরকে বিদেশের মাটিতে শিক্ষার নামে হাজার হাজার বুদ্ধিজীবী নামের বৃত্তিজীবী এবং সেবাদাস তৈরী করছে। আপনি কি এ চক্রান্ত রুখতে চান?
- সাম্রাজ্যবাদীদের এজেন্ট ইউনিসেফ সাহায্য ও শিক্ষার নামে বিনামূল্যে ত্রাণসামগ্রী ও পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করে আমাদের সন্তানদের মূলধারা থেকে বিচ্যুত করার ধারাবাহিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আপনি কি এই চক্রান্ত প্রতিহত করে আমাদের মাটি ও মানুষের উপযোগী ভাবধারা প্রতিষ্ঠা এবং নিজস্ব অর্থায়নে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে চান?
- আপনি কি অন্তঃসারশূন্য, বাকপটু, শঠতায় চ্যাম্পিয়ন, ধাপ্পাবাজ ও অসৎ রাজনৈতিক নেতাদের খপ্পর হতে দেশকে রক্ষা করতে চান?
- আপনি কি দুর্ভাগা এই দেশকে (বিভিন্ন রংয়ের চেতনার নামে) ধ্বংসের রাজনীতি হতে রক্ষা করতে চান?
- আপনি কি অপরিণামদর্শী রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থে সৃষ্ট টাউট-বাটপার ও সন্ত্রাসীদের দাপট হতে অসহায় জনগণকে রক্ষা করতে চান?
- বিদেশী দালাল ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র নানাভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত ও জাতিকে বিভক্ত করে দেশকে পঙ্গু করার ষড়যন্ত্র করছে। আপনি কি এই কৌশলগত ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ জাতি চান?
- বৃটিশ আমলে এ দেশের জনগণকে অব্যাহতভাবে শোষণ করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করেছিলো। বৃটিশেরা এখন নেই। কিন্তু দু'দুবার স্বাধীনতার পতাকা বদলিয়েও গত পঞ্চাশ বছরে নামকাওয়াস্তে সংস্কার ছাড়া প্রশাসনে বড় ধরনের কোন সংস্কার হয়নি। ফলে বৃটিশের পরিত্যক্ত প্রশাসনিক কাঠামোর বদৌলতে বর্তমানে ফায়দা লুটছে দেশীয় কিছু আমলা এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতারা। এছাড়া এই বৃটিশ প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে এদেশের সাধারণ জনগণ শোষিত হচ্ছে নানাভাবে নানা প্রক্রিয়ায়। আপনি কি বৃটিশ আমলে প্রণীত প্রশাসনিক জটিলতা হতে জাতিকে মুক্ত করতে চান?
- আপনি কি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্র কর্তৃক সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট বেকারত্বের অভিশাপ থেকে ব্যক্তি ও জাতির মুক্তি চান?
- বিদেশী দাতাগোষ্ঠি ভারী শিল্প কারখানা বন্ধ করে হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল ও মাছ চাষ করে জাতিকে অর্থনৈতিক মুক্তির পরামর্শ দিচ্ছে। এই সব চাষ করে ভিক্ষাবৃত্তি রোধ করা যায়। কখনো স্থায়ী অর্থনৈতিক মুক্তি আসে না। আপনি কি দেশের ভারী শিল্পকারখানাকে রক্ষা করে অর্থনৈতিক মুক্তি চান?
- ট্রেড ইউনিয়ন করা শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার। ক্ষমতাসীন প্রতিটি রাজনৈতিক দল শিল্প-কারখানায় উৎপাদন চায় না, ট্রেড ইউনিয়নের সমর্থন চায়। এর ফলে ট্রেড ইউনিয়নের নামে নেতাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতাসীন

www.pathagar.com

দলের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প-কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাগুলোতে চলছে নৈরাজ্যকর অবস্থা। আপনি কি এই অসহনীয় অবস্থার পরিত্রাণ চান?

- স্বাধীনতার অব্যবহিত পর তৎকালীন সরকার পাইকারী হারে শিল্প-কারখানাগুলো জাতীয়করণের মাধ্যমে আনাড়ী, অপরিপক্ক ও লুটেরা দলীয় প্রশাসকদের হাতে তুলে দেয়। দলীয় ক্যাডারদের সীমাহীন লুণ্ঠনের ফলে জাতীয়করণকৃত শিল্প কারখানাগুলো গত ৩০ বছরে জাতীয় অর্থগ্রাসী দৈত্যে পরিণত হয়েছে। জাতির ঘাড়ে চেপে বসা এই জাতীয়করণকৃত দৈত্যের কাফ্ফারা দিতে হচ্ছে প্রতি বছর মাত্র ২৫০০ কোটি টাকা। আপনি কি এই জাতীয়করণের অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে চান?
- আপনি কি অনুৎপাদনশীল খাতে কোটি কোটি টাকা খরচসহ ভূয়া ও জনগুরুত্বহীন প্রজেক্ট এবং গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নামে সম্পদের লুটপাট এবং বিদেশে সম্পদ পাচার রোধ করতে চান?
- আপনি কি নব্য অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের শোষণমূলক ঋণব্যবস্থা হতে জাতীয় অর্থনীতির মুক্তি চান?
- আপনি কি আভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে বিদেশীদের চক্রান্ত হতে অব্যাহতি এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে চান?
- আপনি কি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চোরাচালানীদের চিহ্নিত করে চোরাচালান ও অবৈধ মজুতদারী ব্যবসা এদেশ হতে চিরতরে দূর করতে চান?
- আপনি কি সকল প্রকার পরনির্ভরশীলতা পরিহার করে বিশ্বের দরবারে আত্মমর্যাদাশীল সম্মানিত জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে চান?
- আপনি কি সম্পদের সুষম বন্টন এবং ইনসাফভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে চান?
- আপনি কি বিলাসিতায় আধুনিক প্রযুক্তি পরিহার করে দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে আধুনিক প্রযুক্তি আমদানী করতে চান?
- স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ১৯৭৪ সালে তৎকালীন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদেরকে বাঙ্গালী বানাতে গিয়ে যে অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছিলো তা আজো জ্বলছে। কয়েক লাখ চাকমার দাপটে সমস্ত জাতি আজ তটস্থ। এমনকি তাদের দাপটে সরকার স্থানীয় বাঙ্গালীদেরকে "অ-পাহাড়ী" আখ্যায়িত সমগ্র করে জাতিকে অপমানিত করছে। আপনি কি এই অবস্থার সম্মানজনক সমাধান চান?
- আপনি কি প্রতিবেশী দেশ কর্তৃক জাতির উপর চাপিয়ে দেয়া বহুবিধ সীমান্ত ও পানি সমস্যার সম্মানজনক সমাধান চান?
- আপনি কি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় তাঁবেদার সরকার কর্তৃক সম্পাদিত ৩০ বছরের নিষ্ফল পানি চুক্তিসহ আনাড়ী, অপরিপক্ক ও দুর্বল সরকারের নতজানু

www.pathagar.com

পররাষ্ট্রনীতির সুযোগে যেসব অসম ও অসম্মানজনক চুক্তির যাঁতাকলে জাতিকে আবদ্ধ করে দিয়েছে, সেসব চুক্তি বাতিল করতে চান?

☞ সৎ নেতৃত্ব ও গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য ভোট পদ্ধতি হলো সর্বোত্তম পন্থা। কিন্তু গত ত্রিশ বছরে কালো টাকা, সন্ত্রাসী ও পেশী শক্তির ভোটের মাধ্যমে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে ভোটের মাধ্যমে শোষক বদলায়; শোষণ বদলায় না। নেতা বদলায় নীতি বদলায় না। আপনি কি আগামীতে একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নেতা ও নীতি বদলাতে চান?

☞ আমাদের সম্পদের অভাব নেই; অভাব রয়েছে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের। আপনি কি দেশে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ?

☞ ইসলামী আইনে নারীর অধিকার, কল্যাণ, সম্মান ও মর্যাদা সুরক্ষিত রয়েছে। অথচ পাশ্চাত্যের দাতাগোষ্ঠি ও তাদের এদেশীয় দালালেরা ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে নারীর সমঅধিকারের নামে আমাদের ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক প্রথাকে ভেঙ্গে দিয়ে জংলী সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করে এদেশকে জাহান্নামের রাস্তায় ঠেলে দেবার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আপনি কি এই জংলী সভ্যতা প্রতিষ্ঠার বিরোধী?

☞ আপনি কি কুসংস্কারমুক্তর বেলেল্লাপনা অপসংস্কৃতি ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবী কর্তৃক বিকৃত ইতিহাস সৃষ্টির অপচেষ্টা প্রতিরোধ করে আবহমান ঐতিহ্যে লালিত আমাদের সুন্দর, সুস্থ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংস্কৃতি লালনের মাধ্যমে নিজস্ব চেতনার সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চান?

☞ আপনি কি আগামী বংশধরদের জন্য নিরাপদ ও সন্ত্রাসমুক্ত আবাসভূমি এবং এই জাতিকে সভ্যতার নূতন ঠিকানায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিশ্বাসী?

উপরোক্ত বিষয়ে আপনার উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তবে আগামী বংশধরদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে তথাকথিত গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার মুখোশধারী রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ এবং সোচ্চার হোন।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯৪৮ সালের ১১ অক্টোবর তৎকালীন ঢাকা জেলা বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত গজারিয়া থানায় অবস্থিত আড়ালিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নদী ভাঙনের ফলে ১৯৬৪ সালে তাঁর পিতা দাউদকান্দি থানার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পিতার নাম তোতা মিয়া সরকার। পারিবারিক অর্থনৈতিক দীনতার কারণে তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি বটে; কিন্তু নিজ যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রতিভাবলে দেশের সর্ববৃহৎ ঐতিহ্যবাহী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান বুক প্রমোশন প্রেস এবং জাতীয় দৈনিক মিল্লাত পত্রিকায় পর্যায়ক্রমে ২৬ বছর যাবত অত্যন্ত নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৬ থেকে '৯৮ পর্যন্ত তিন বছর উক্ত পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। দৈনিক মিল্লাত ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় স্বনাম এবং "ইবনে কাশিম," ও "রাজহংস" ছদ্মনামে বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী হয়ে তিনি মুন্সীগঞ্জ-৪ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এছাড়া তিনি জাতিসত্ত্বা পরিষদের আহবায়ক এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের একজন সম্মানিত সদস্য। তিনি তিন কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক। বর্তমানে তিনি লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছেন।

লেখকের অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ

- রাহুর কবলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি (১ম খন্ড)
- ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত
- বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুসলমান
- নারী নির্যাতনের রকমফের
- ইতিহাসের বাঁকে মুহাম্মদ নূরউল্লাহ

প্রকাশের অপেক্ষায়

- রাহুর কবলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি (২য় খন্ড)
- সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা : সেকাল-একাল
- ইতিহাস বিকৃতির ইতিবৃত্ত
- শাসন-শোষণ ও আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল দর্শন
- বাংলাদেশের ইতিহাস অভিধান
- বিবিধ সংলাপ (নির্বাচিত কলাম)
- ছহি বড় বুদ্ধিজীবী জঙ্গনামা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ
বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com